প্রথম প্রকাশ : কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা, ১৩৬৭

প্রকাশক :

বরুণ গঙ্গোপাধ্যায়

বুক ট্রাস্ট

পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা

৩০/১ বি কলেজ রো, কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর :

অশোক কুমার ঘোষ

নিউ শশী প্রেস, ১৬ হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট ; কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা :

মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

উৎসর্গ

লোক-সংস্কৃতি চর্চায় আমার হাতেখড়ি যাঁর কাছে

অধ্যাপক ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য

শ্রীচরণেষু

সূচী

নিবেদন

'লোক-সংস্কৃতি : নানা প্রসঙ্গ' মূলতঃ বাংলা লোক-সাহিত্য সম্পর্কিত কয়েকটি প্রবন্ধের সংকলন। তবে লোক-সংস্কার এবং লোক-উৎসব সংক্রান্ত একাধিক প্রবন্ধকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে বর্তমান গ্রন্থে। সংকলিত প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় পূর্বেই প্রকাশিত হয়েছে, কেবল শেষ দু'টি প্রবন্ধ এ পর্যন্ত অন্য কোথাও প্রকাশিত হয় নি।

বেশ কয়েকটি প্রবন্ধের বিষয়বস্তু এমনই যে সে'গুলি নিয়ে পৃথক পৃথক গ্রন্থ রচিত হতে পাবে। স্বভাবতঃই, পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচিত হতে পারে যে বিষয়ে, প্রবন্ধের স্বল্প পরিসর ক্ষেত্রে সেই বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা সম্ভবপর হয় নি। আর একটা কথা। বর্তমান গ্রন্থটি লোক-সাহিত্য ও সংস্কৃতির তাত্ত্বিক পণ্ডিতদের জন্য নয়।

বর্তমান গ্রন্থটির ভূমিকা লিখেছেন 'বাংলা একাডেমী'র (ঢাকা) ভূতপূর্ব মহাপরিচালক এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য, সুপ্রতিষ্ঠিত লোক-সংস্কৃতিবিদ্ ডঃ মযহারুল ইসলাম। বলাবাহুল্য তাঁর লিখিত দীর্ঘ ভূমিকাটির সংযোজন গ্রন্থটির মর্যাদাকে বিশেষভাবে বৃদ্ধি করেছে।

অতি অল্প সময়ের মধ্যে সুচারু রূপে গ্রন্থটি প্রকাশ করার জন্যে প্রকাশক বন্ধুবর বরুণ গঙ্গোপাধ্যায় লেখকের ধন্যবাদার্হ হয়েছেন।

বরুণকুমার চক্রবর্তী

ভূমিকা

বর্তমান বিশ্বে ফোকলোর একটি বহুল আলোচিত বিষয়। এর প্রাঙ্গণ যেমন বিস্তৃত তেমনি বিচিত্র। যাঁরা ফোকলোরকে ভালবেসে সংগ্রহে ও আলোচনা-পর্যালোচনায় অংশ গ্রহণ করেছেন, তাঁরা আমাদের শ্রদ্ধেয়। কিন্তু আরেকদল আছেন, যাঁদের সংখ্যাও কম নয়, যাঁরা ফোকলোরানুরাগী নন, তবে নিজস্ব বিষয়ের প্রয়োজনে ফোকলোরের দ্বারস্থ হয়েছেন, তাঁরাও আমাদের বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র, কেননা তাঁরা ফোকলোরের পঠন-পাঠনে অপর বিষয়ের সঙ্গে ফোকলোরের যোগাযোগের চমৎকার সেতু নির্মাণ করেছেন। অনেক ক্ষেত্রেই ফোকলোর-বিজ্ঞানীদের চেয়ে এই 'দায়ে পড়ে ঘরে আসা'-দের দীপ-বর্তিকার সমুজ্জ্বল শিখায় ফোকলোরের গৃহখানি অধিক দীপ্তিময় মনে হয়। 'যারে দেখতে নারি তার চরণ বাঁকা' এই মনোভাবটি ফোকলোরের অঙ্গন থেকে এখন প্রায় অপসৃত। গ্রামের নববধূটি তার স্বামীকে সইতেও পারে না, ছাড়তেও পারেনা, এমন ভাবটি ফোকলোরের সংসার থেকে ধীরে ধীরে বিদায় নিচ্ছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে বর্তমান শতাব্দীর প্রায়ার্ধ-কাল পর্যন্ত যে দুঃসহ দ্বন্দ্ব ছিল তা এখন বহুলাংশে শিথিল হয়েছে। ফোকলোরকে এখন মোটামুটি সহনশীলদের সংসার বলা যায়, এর পরিবারে সদস্যসংখ্যা যেমন বেড়েছে, তেমনি বেড়েছে সদস্যদের বৈশিষ্ট্যগত ভিন্নমুখিতা। সবই শুভলক্ষণ। পাশ্চাত্য দেশের কথা ছেড়েই দিলেম, আমাদের এই উপমহাদেশেও, যেখানে আমরা প্রায় সবাই ফোক, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহের ভাষায়, "বাতাসের মধ্যে বাস করে যেমন আমরা ভুলে যাই যে, বায়ু-সাগরে আমরা ডুবে আছি, তেমনি পাড়াগাঁয়ে থেকে আমাদের মনেই হয় না যে, এখানে কত বড় সাহিত্য ও সাহিত্যের উপকরণ ছড়িয়ে আছে", সেখানে ফোকলোরকে নিয়ে আমাদের যে খুঁত খুঁতে ভাবটি এই সেদিন পর্যন্ত প্রচণ্ডভাবে বিদ্যমান ছিল, তা এখন প্রায় লোপ পেতে বসেছে। এটি আশার কথা। মদিনা বিবিকে আমরা ঘোমটার আড়াল থেকে দেখেছিলাম অথবা দেখবার প্রয়োজনই বোধ করি নি, ময়মনসিংহের অখ্যাত এক গ্রামের কন্যা। কিন্তু তার নেকাব উন্মোচন করলেন একজন পাশ্চাত্য পণ্ডিত, রোমাঁ রোলাঁ, মদিনা মহুয়ার সৌন্দর্যে বিমুগ্ধ চিত্তের নৈবেদ্য নিবেদন করলেন তিনি। আমাদের চৈতন্যোদয় হলো। নোবেল পুরস্কার-প্রাপ্ত রবীন্দ্রের বেলায় যেমন। আজো ভারতীয় লোক-কাহিনীর একটি বিজ্ঞান-সম্মত সম্পাদনায় আত্মনিয়োগ করেছেন একজন পাশ্চাত্য ফোকলোর বিজ্ঞানী, রিচার্ড এম. ডরসন। আমাদের হাত দিয়ে যা বেরিয়েছে তার প্রবেশ অন্যত্র সম্ভব, বিজ্ঞানের জটিল ভুবনে নয়।

ফরাসী দার্শনিক পাসকাল যা বলেছিলেন তার বঙ্গানুবাদ করলে দাঁড়ায়, "মানুষ ক্ষুদ্র তৃণের মত প্রকৃতির এক দুর্বলতম বস্তু। তবে সে তৃণ হলেও মননশীল। প্রকৃতি যদি তাকে ধ্বংস করতে চায় তবে একটিমাত্র ফুৎকারেই

তা সম্ভব, এর জন্যে প্রকৃতিকে যুদ্ধ সাজে সাজতে হয় না। কিন্তু তথাপি মৃত্যুর সামনাসামনি দাঁড়িয়েও মানুষ প্রকৃতির চেয়ে মহত্ত্বে অনেক বিশিষ্ট। কেননা মানুষ মৃত্যুকে চিনতে পারে চেতনার দ্বারা, অন্যপক্ষে ঘাতক প্রকৃতি চৈতন্যহীন। মননই মানুষকে বিশিষ্টতা ও মহত্ত্ব দান করেছে।"

মননের সাথে যুক্ত হয়েছে মানুষের জৈব মমত্ববোধ, যা থেকে জৈব আত্ম-রক্ষার তাগিদে বিজ্ঞানের প্রথম বিকাশ, যদিও সেই জৈব তাগিদের যান্ত্রিকতাই তার সবটা নয়। সত্যের প্রতি মানুষের শুধু একটি আকর্ষণ নেই, আছে যাদু, আছে আনন্দ। মানুষ এক সময়ে দূর অতীতে এই দেখে বিস্মিত হয়েছিল যে, সমকোণ যুক্ত একটি ত্রিকোণকে যে-রকম করেই আঁকা হোক না কেন, তার হ্রস্ব বাহু দুটির বর্গের যোগফল দীর্ঘ বাহুটির বর্গফলের সমান। এই সত্য পিথাগোরাসকে শুধু অভিভূত করে নি, আনন্দ দিয়েছিল। এই আনন্দ থেকেই গ্রীক ও মিসরীয় চেতনায় ব্যবহারিক বিজ্ঞানের যাত্রারম্ভ। একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দী থেকে প্রাচীনতার কাঠামো ভেঙ্গে প্রবেশ করতে লাগলো নব নব জ্ঞানের কলাকুশলতা। তারপর রেনেসাঁ। জ্ঞানের ব্যবহার্যতা বেকনের ভাষায় নব মর্যাদায় সিক্ত হলো, যার সামঞ্জস্য মহাবিশ্বের প্রবহমানতায় লক্ষ্য করে বিমুগ্ধ হলেন স্পিনোজা। এর অনুরণন ঝংকৃত হলো সাহিত্যে। মনন ও মমত্ববোধের পাশে দণ্ডায়মান আবেগ যে সাহিত্যের প্রাণশক্তি তার মূল্যায়ন ঘটলো নবলব্ধ প্রজ্ঞার নিরিখে। প্রমাণিত হলো, সাহিত্যও বিজ্ঞানের বাইরের কোন বস্তু নয়। তার বিচার বিশ্লেষণের পালা-বদল ঘটতে থাকলো, ধীরে ধীরে যার আওতায় এলো লোকসাহিত্য, বৃহত্তর পরিসরে ফোকলোর। বিজ্ঞান আমাদের অনুষঙ্গী।

ফোকলোর-এর ক্ষেত্রে আমরা এযাবৎ সংগ্রাহকের ও সংগ্রহ-প্রকাশের দায়িত্ব পালন করে এসেছি। ফোকলোর-বিজ্ঞানীর যে সাধনা তা আমাদের আজ পর্যন্ত প্রায় অনায়ত্ত রয়ে গেছে। ইউরোপ আমেরিকাতে নৃতত্ত্ববিদ, ভাষাবিজ্ঞানী, মনোবিজ্ঞানী, জাতিতত্ত্ববিদ, সমাজবিজ্ঞানী, ঐতিহাসিক ও ফোকলোরবিদ প্রভৃতির মধ্যে ফোকলোরকে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার বিশ্লেষণের এক সাড়া লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আমরা অনেকেই এখনো সেই মূল প্রবাহ-ধারা থেকে দূরে দাঁড়িয়ে পরম নির্ভাবনায় সময় যাপন করে চলেছি। বয়স্কদের কথা না হয় নাই ধরলাম, কিন্তু এই স্রোতো-প্রবাহে ঝাঁপিয়ে পড়বেন এমন তরুণের সম্ভাবনাও তো বিশেষ উজ্জ্বল মনে হচ্ছে না। বিজ্ঞানের সর্বস্তরে যেমন, ফোকলোরের বিভিন্ন স্তরেও তেমনি, ক্রমাগত চিন্তাভাবনার ও ধ্যান ধারণার পরীক্ষা নিরিক্ষার ফলে নব নব জ্ঞানের ও চেতনার উদ্ভব এবং বিকাশ ঘটছে। এক সময়ে যে ঐতিহাসিক ভৌগোলিক পদ্ধতি আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল আজ তার আবেদন শিথিল হয়ে পড়েছে—যে টাইপ ও মটিফ ইনডেক্স

ডায়াক্রনিক পঠন পাঠনে অপরিহার্য বিবেচিত হতো, আজ তার স্থান বহুলাংশেই দখল করেছে সিনক্রোনিক পাঠ পরিক্রমা। ফোকলোরের সকল প্রাঙ্গণে এখন গঠনগত বিশ্লেষণ বা ষ্ট্রাকচারাল এনালাইসিস, মেটা ফোকলোর (Metafolk lor ·), পারফরমেন্স প্যারাডাইম (Paradigm) মডেল এনালাইসিস ইত্যাদি শুধু প্রভাব নয়, বলা যায়, দারুণ প্রতাপ বিস্তার করেছে। লোকসাহিত্যের সাহিত্য মূল্য বা সামাজিক গুরুত্ব বিচারের সাথে সাথে আমাদেরও এখন এই সমস্ত রীতি ও পদ্ধতির আলোকে লোকসাহিত্যের পাঠ পর্যালোচনা ও মূল্যায়নকে নিয়ন্ত্রণ করা কর্তব্য।

ডক্টর বরুণকুমার চক্রবর্তীর পথ যদিও ভিন্ন, অর্থাৎ সে সাহিত্য ও সামাজিক মূল্য এবং ইতিহাসগত চেতনাকেই ফোকলোরের ক্ষেত্রে মূল্যবহ বিবেচনায় সে-পথেই নিরলস ভাবে কাজ করে চলেছে, কিন্তু তার উদারতা এখানে যে, সে সত্যিকার ফোকলোর-বিজ্ঞানীদের প্রতি যেমন, বৈজ্ঞানিক পঠন-পাঠনের প্রতিও তেমনি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল। এশিয়াটিক সোসাইটিতে পঠিত টডের রাজস্থান সম্পর্কিত একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ পাঠে সে প্রথম আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল - ডক্টর চক্রবর্তী যে একজন কৃতী গবেষক তার উল্লিখিত প্রবন্ধে তার পরিচয় মূর্ত হতে দেখেছি। ইতিমধ্যে বরুণের 'বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস', 'সাহিত্য সমীক্ষা', 'বাংলা প্রবাদে স্থান-কাল-পাত্র' এবং 'লোক-বিশ্বাস ও লোক-সংস্কার' প্রভৃতি গ্রন্থ আমার হাতে এসেছে। প্রথমোক্ত গ্রন্থটিতে বরুণ আমাদের লোক-সাহিত্য চর্চার একটি ধারাবাহিক ইতিহাস উপস্থিত করেছে। অনেক অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও এই জাতীয় প্রয়াস "বাংলা লোক-সাহিত্য চর্চার ইতিহাসে"ই প্রথম। তাই তাকে আন্তরিক সাধুবাদ দিই। জয়দেবের উপমা থেকে শুরু করে কবিগুরুর প্রৌঢ় ঋতুর ফসল, প্রবাদে দেবদেবী থেকে আরম্ভ করে ঐতিহাসিক চরিত্র এবং সামাজিক রীতি নীতি, লোক সংস্কারে স্ববিরোধিতা থেকে লোক-বিশ্বাসে কৃষি বৃষ্টি ভোজন বিবাহ গর্ভ বাচ্চা ইত্যাদি সম্পর্কিত আলোচনা ও বিশ্লেষণ ডক্টর চক্রবর্তীর অপর গ্রন্থগুলোর সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করেছে। প্রত্যেক বিষয়েই বরুণ তার বক্তব্যে তথ্যনিষ্ঠ, বিশ্লেষণে স্বনির্ভর হতে একান্ত প্রয়াসী,—তার উপস্থাপন-রীতি ঋজু। কোন কোন ক্ষেত্রে তার শ্রমের সঙ্গে মৌলিকতার মিলন ঘটেছে এবং তা প্রণিধানযোগ্য।

'লোক-সংস্কৃতি : নানা প্রসঙ্গ' গ্রন্থটিতে ছোট বড় অনেকগুলো প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। কয়েকটি প্রবন্ধে বরুণ প্রশংসনীয় নিজস্ব ঐকান্তিকতার পরিচয় দিয়েছে। 'বাংলা লোক-সঙ্গীতে কলকাতা' প্রবন্ধে একটি নতুন দিক উন্মোচিত হয়েছে যা বিস্তারিত আলোচনার দাবী রাখে। কোলকাতা শুধু সঙ্গীতে নয়, ফোকলোরের অন্যান্য শাখাতেও মূর্তিমান। সংগ্রহ করলে এবং সংগৃহীত উপাদানকে সুনিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে বিচার করলে এ-বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ হতে

পারে। সে গ্রন্থের অন্যতম মূল উপপাদ্য বিষয় হতে পারে বর্তমান বিশ্বে ফোকলোর। আমাদের একটি বদ্ধমূল ধারণা জন্মেছে যে, ফোকলোর শুধু অতীতের, বর্তমানের কেউ নয়, ফোকলোর শুধু পশ্চাদপদ সমাজের, ফোকলোর শুধু গ্রামের, ফোকলোর শুধু অশিক্ষিত মানুষের—কোলকাতা কেন্দ্রিক এবং কোলকাতা সম্পর্কিত ফোকলোর একটি গ্রন্থাকারে সুসম্পাদন করে এই ভ্রান্ত ধারণার নিরসন করা যায়। অবশ্য বরুণ এই গ্রন্থের "বাংলা লোক-সঙ্গীতে সমসাময়িক জীবন ও প্রতিক্রিয়া" প্রবন্ধে এই ধারণার নিরসনে ব্রতী, কিন্তু তা যথেষ্ট নয়। 'বাংলা লোক-সঙ্গীতে অসাম্প্রদায়িক চরিত্র' প্রবন্ধটি বরুণের আরেকটি প্রশংসনীয় পদক্ষেপ। এ-বিষয়টিও একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থের দাবী রাখে। বরুণের আলোচনায় অনেকের উল্লেখের সঙ্গে লালনের নামটি দেখলে আমি আরো খুশী হতেম, লালনকে বাদ দিয়ে বাংলা লোক সঙ্গীতের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র এবং অন্য যে কোন আলোচনাই সম্পূর্ণ হতে পারে না। 'সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে, লালন ভাবে জাতের কি রূপ দেখলাম না এই নজরে' এমন করে বাংলা ভাষায় আর কেউ ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলতে পারেন নি। তাছাড়া আরব-পারস্যের কাহিনী যে কি ভাবে ভারতীয় কাহিনীর সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হয়েছে, বাংলা লোক সঙ্গীতে তার অজস্র প্রমাণ বিদ্যমান। কারবালার প্রান্তরে দাঁড়িয়ে হুসেন রাম-লক্ষ্মণের দৃষ্টান্ত খুঁজেছেন, বন্দিনী সীতার শোকার্ততা এজিদ-গৃহে বন্দিনী জয়নবের হাহাকারে প্রমূর্ত।

প্রীতিভাজন বরুণ চক্রবর্তী ফোকলোরের গঠনমূলক পরিসর সৃষ্টিতে একজন নিরলস কর্মী—এর সুসংহত বলয় নির্মাণে একজন নিবেদিত চিত্ত কারিগর। তার বক্তব্যের সাথে সব সময় সবাই একমত হবেন এমন নয়, তার গ্রন্থ-সমূহের বিরূপ-সমালোচনারও প্রচুর অবকাশ আছে, কিন্তু সে একদিকে সংগ্রহে অন্যদিকে সংগৃহীত উপাদানের মূল্যায়নে নিরবচ্ছিন্নভাবে তৎপর এবং এই তৎপরতা আনন্দের বিষয় পাণ্ডিত্য-বিবর্জিত নয়, বিচক্ষণতা-রিক্ত নয়। এ-কারণেই অকুণ্ঠ চিত্তে তার প্রশংসা করতে ইচ্ছে করে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস তার অন্যান্য গ্রন্থ যেমন, "লোক সংস্কৃতি : নানা প্রসঙ্গ" গ্রন্থটিও তেমনি জনপ্রিয়তা লাভ করবে এবং সুধীজনের সমাদর পাবে। একথাও নিশ্চিত যে, 'লোক-সংস্কৃতি : নানা প্রসঙ্গ' গ্রন্থটি আমাদের ছাত্রছাত্রীদের প্রচুর উপকার সাধন করবে এবং গবেষকগণও এ-থেকে বিশেষভাবে উপকৃত হবেন। আমি গ্রন্থটির বহুল প্রচার এবং লেখকের কল্যাণ কামনা করি।

বাংলা ছড়ার পাঠান্তর

রবীন্দ্রনাথ যদৃচ্ছভাসমান মেঘের সঙ্গে বাংলা ছড়াগুলিকে তুলনা করে বলেছেন : 'উভয়েই পরিবর্তনশীল, বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত, বায়ুস্রোতে যদৃচ্ছভাসমান।' বাস্তবিক লোকসাহিত্যের বিভিন্ন উপাদানের ক্ষেত্রেই যদিও এই পরিবর্তনশীলতা লক্ষিত হয়ে থাকে, তবু বাংলা ছড়ার ক্ষেত্রেই এই পরিবর্তনশীলতার মাত্রা যেন সর্বাধিক।

ব্যক্তিবিশেষের রচনা সকলের উপভোগ্য হতে পারে, কিন্তু তাকে ইচ্ছামত পরিবর্তিত করার অধিকার কারো নেই। কেবল লেখক নিজেই প্রয়োজনবোধে এক সংস্করণে প্রকাশিত রচনা অন্য সংস্করণে পরিবর্তন করার অধিকারী এবং প্রয়োজন বোধে পরিবর্তন করেও থাকেন। কিন্তু লোকসাহিত্য যেহেতু সংহত সমাজের সৃষ্টি, ব্যষ্টির সৃষ্টি নয়, তাই এক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মালিকানার রীতি প্রযুক্ত হয় না। অর্থাৎ একই উপাদান, একই রচনা বিভিন্ন জনের হাতে পড়ে বিভিন্ন রকম রূপ লাভ করে। তবু লোকসাহিত্যের অপরাপর উপাদান যেমন—প্রবাদ, ধাঁধা, গান কিংবা লোককথার তুলনায় ছড়ার রাজ্যেই পাঠান্তর কেন সর্বাধিক লক্ষিত হয়, বর্তমান প্রবন্ধে আমরা বিশেষভাবে সেই বিষয়েই আলোচনা করবো। কিন্তু তার আগে আমরা কয়েকটি ছড়ার পাঠান্তর উদ্ধার করছি।

সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার ১৩০৩ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যায়

'ছড়া' পর্যায়ে কুঞ্জলাল রায়ের সংগৃহীত একচল্লিশটি ছড়া প্রকাশিত হয়েছে। তন্মধ্যে দশ সংখ্যক ছড়াটি হল—

আগ্‌ডুম বাগ্‌ডুম
ঘোড়াডুম সাজে,
লাল ঘেঘর,
ঘাঘর বাজে,
বাজতে বাজতে
চল্লো ডুলি,
ডুলি গেল সেই কমলাপুলী,
কমলা পুলীর টিয়েটা
সূর্য্যি মামার বিয়েটা
হাড় মড় মড় কেলে জিরে,
রুস্তুম কুস্তুম পানের বিড়ে,
চল পিয়ারী হাটে যাই,
হাটে যেয়ে কি খাই,
পান কোশাটা কিনে খাই,
একটি পান ফোঁপরা,
দু সতীনে ঝগড়া
শাস্তের উপর ধেয়ে নাচে,
জল তোলাবার বয়স আছে,
দিনের ভাগে খায় কি ?
কেলে গোরুর দুধ,
তেল কুচ্‌কুচ্‌ বেগুন ভাজা, কুচ্‌॥

এই ছড়াটিরই আর একটি পাঠান্তর কুঞ্জলাল রায়ের সংগৃহীত চোদ্দ সংখ্যক ছড়ায় বিধৃত হয়েছে—

আগাডোম বাগাডোম ঘোড়াডোম সাজে।
ডান সিগড়ি ঘুঁগুর বাজে॥

বাজ্‌তে বাজ্‌তে পড়লো ধুলি।
ধুলি গেল মোর কমলাপুলি॥
কমলা পুলির টিয়েটা।
সূর্য্যি মামার বিয়েটা॥
হাড় মড় মড় কাল জিরে।
রসুন কসুন পানের বিঁড়ে॥
আয় লঙ্গ হাটে যাই।
পান সুপারি কিনে খাই॥
একটী পান কোঁকড়া।
মায়ে ঝিয়ে ঝগড়া॥
পান খাবি না খিলি খাবি।
টাঙ্কা মেরে চলে যাবি॥
নাচ দুয়ারে ব্যাঙের কুটী।
ঝাপ দিয়ে দিয়ে একটী মুটী॥

এই একই ছড়ার আরও একাধিক পাঠান্তরের সাক্ষাৎ পাওয়া গেছে বিভিন্ন জনের সংগ্রহে। যেমন ড. বিজন বিহারী ভট্টাচার্য সংকলিত 'ছড়াছড়ি' (১৩৫৭) পুস্তিকায় এই ছড়াটিরই ঈষৎ পরিবর্তিত এক রূপের সন্ধান মেলে—

অ্যাংটুল ব্যাংটুল ঘোড়াটুল সাজে
ঢাল মেঘর ঘোঘর বাজে॥
বাজতে বাজতে চলল ডুলি।
ডুলি গেল কমলাপুলি॥
কমলাপুলি টিয়েটা।
সূর্য্যিমামার বিয়েটা॥
আয় রঙ্গ হাটে যাই।
পান সুপারি কিনে খাই॥
একটি পান ফোঁপরা।
মায়ে ঝিয়ে ঝগড়া॥

হলুদ বনে কলুদ ফুল।
মামার নামে টগর ফুল॥

মুর্শিদাবাদে এই ছড়াটির অন্য যে এক রূপ প্রচলিত আছে সেটি হল—

আগ্‌ডম্ বাগ্‌ডম্
সাজে কুজে।
খুকু বাঁধে খুকু খাই,
হেন খুকু দুঃখ পায়।
হেন কা ছুটা পানের বাটা,
তুলে আনগা কাপাস কোটা।
ইলির ডুয়ে দিলি ফুল,
শাক শীতল কামরা॥

রবীন্দ্রনাথ সংগৃহীত এই ছড়াটির চারটি পাঠের মধ্যে একটি পাঠ উদ্ধার করা গেল—

আগ্‌ডুম বাগ্‌ডুম ঘোড়াডুম সাজে।
ঢাঁই মির্‌গেল ঘাঘর বাজে॥
বাজতে বাজতে প'ল ঠুলি।
ঠুলি গেল কম্‌লাফুলি॥
আয় রে কম্‌লা হাটে যাই।
পান গুয়োটা কিনে খাই॥
কচি কুমড়োর ঝোল
ওরে জামাই গা তোল্॥
জ্যোৎস্নাতে ফটিক ফোটে—
কদম তলায় কে রে।
আমি তো বটে নন্দ ঘোষ—
মাথায় কাপড় দে রে॥

এবারে অন্য একটি ছড়ার পাঠান্তরের সন্ধান নেওয়া যাক।

সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত [১৩০৩, বৈশাখ] কুঞ্জলাল রায়

সংগৃহীত চল্লিশ সংখ্যক ছড়াটি হল ঘুমপাড়ানির ছড়া, যেটির সঙ্গে আমরা সকলেই পরিচিত—

তালগাছ কাটম।
বোসের বাটম॥
গৌরী গো ঝি,—।
তোমার কপালে বুড়ো বর
আমি কর্বো কি॥
চোখ খাক তোর মা বাপ,
চোখ খাক তোর খুড়ো।
এমন বরকে বে দিয়েছে,
তামাক খেকো বুড়ো॥
বুড়োর নল গেল ভেসে।
বুড়ো তামাক খাবে কিসে॥

রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এই ছড়াটির আর একটি পাঠ সংগ্রহ করে প্রকাশ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সংগৃহীত ছড়াটি ছিল এইরকম—

তালগাছ কাটম বোসের বাটম গৌরী এল ঝি।
তোর কপালে বুড়ো বর আমি করব কী॥
টঙ্কা ভেঙে শঙ্খা দিলাম, কানে মদনকড়ি।
বিয়ের বেলা দেখে এলুম বুড়ো চাপদাড়ি॥
চোখ খাও গো বাপ—মা, চোখ খাও গো খুড়ো।
এমন বরকে বিয়ে দিয়েছিলে তামাকখেগো বুড়ো॥
বুড়োর হুঁকো গেল ভেসে, বুড়ো মরে কেশে।
নেড়ে চেড়ে দেখি বুড়ো মরে রয়েছে।
ফেন গালবার সময় বুড়ো নেচে উঠেছে॥

এইবার যোগীন্দ্রনাথ সরকার সংকলিত 'খুকুমণির ছড়া'য় প্রকাশিত ২১১ সংখ্যক ছড়াটির উদ্ধার করা গেল—

ধন ধন ধন,

বাড়ীতে ফুলের বন।
এ ধন যার ঘরে নাই
তার কিসের জীবন ?
তারা কিসের গরব করে ?
আগুনে পুড়ে কেন না মরে ?

পরবর্তীকালে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর 'বাংলার লোক সাহিত্য' গ্রন্থের ২য় খণ্ডে এই ছড়াটিরই কয়েকটি পাঠান্তর প্রকাশ করেছেন। বর্ধমান থেকে সংগৃহীত ১৯ সংখ্যক ছড়াটি হ'ল—

ধন ধন ধন।
বাড়ীতে নটের বন।
এ ধন যার ঘরে নাই তার বৃথায় জীবন ॥
তারা কিসের গরব করে।
উনুনে পুড়ে কেন না মরে ॥

২৩-সংখ্যক ছড়াটি হ'ল—

ধন ধন ধন
দর্প নারায়ণ ॥
এ ধন যার ঘরে নাই সে কিসের গরব করে।
এ ধন যার ঘরে নাই সে বৃথায় জীবন ধরে ॥

শেষোক্ত ছড়াটি বাঁকুড়া জেলা থেকে সংগৃহীত।

এইবার রবীন্দ্রনাথ সংগৃহীত ৬২ সংখ্যক ছড়াটির পাঠ উদ্ধার করা গেল—

হরম বিবির খড়ম পায়।
লাল বিবির জুতো পায় ॥
চল্ লো বিবি ঢাকা যাই—
ঢাকা গিয়ে ফল খাই।
সে ফলের বোঁটা নাই ॥

অপরপক্ষে মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীন কাসিমপুরী সঙ্কলিত 'লোকসাহিত্যে ছড়া' গ্রন্থের ৩৭ সংখ্যক ছড়াটি হ'ল—

অরম দিদির খড়ম পায়।
লাল দিদির জুতা পায়॥
আয় লো দিদি ঢাকা যাই,
ঢাকা যাইয়া ফল খাই
এই ফলের গুটা নাই।
খাইলে ফল মরণ নাই॥

কাসিমপুরীরই নেত্রকোণা থেকে সংগৃহীত অনুরূপ ছড়াটি হ'ল—

নরম বিবির খড়ম পাও,
উঠ্‌ঠ্যা বিবি কালাই খায়।
কালাই খাইয়া ঢাকা যাও।
ঢাকা গিয়া ফল খাও॥
এই ফলের গুটা নাই।
খাইলে ফল মরণ নাই॥

এ'রকম উদাহরণ আরও অনেক দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু উদাহরণের আধিক্য আর না ঘটিয়ে এইবার আমরা ছড়ার এই বিভিন্ন পাঠান্তরের কারণ বিশ্লেষণে প্রয়াসী হব।

কবিতায় যেমন একটা ভাবসঙ্গতি রক্ষা করার আবশ্যকতা আছে, ছড়ার ক্ষেত্রে কিন্তু তেমন কোন বাধ্য-বাধকতা নেই; বরং ছড়ার ক্ষেত্রে আদ্যন্ত যদি ভাবসংহতি বজায় থাকে, তবে তাতে ছড়ার মর্যাদারই হানি ঘটে। আদর্শ ছড়ায় তাই একটি অখণ্ড ভাব কিংবা ভাবনার পরিবর্তে স্থান লাভ করে অসংলগ্ন কয়েকটি ভাব, টুকরো টুকরো বিচ্ছিন্ন কয়েকটি ছবি। আর এই কারণেই অনেকেই ছন্দোনির্মিতি কৌশলকে অবলম্বন করে ছড়া রচনায় প্রয়াসী হন। সম্পূর্ণ একটি ছড়া রচনার ক্ষমতা কিংবা অবকাশ না থাকলেও অনেকেই পংক্তি বিশেষে, কখনও বা বিশেষ বিশেষ শব্দ প্রয়োগে নিজস্বতার স্বাক্ষর রাখেন। এক্ষেত্রে ছড়ার মূল কাঠামোটি কিন্তু বজায় রাখা হয়। এইভাবে একটি ছড়ার পাঠান্তর ঘটে।

আবার অনেক সময়ে অনিচ্ছাকৃতভাবেও ছড়ার অংশবিশেষ পরিবর্তিত

হয়ে যায়। লোকসাহিত্যের ছড়া স্মৃতি নির্ভর হওয়ায়, অনেক সময়ই তা সম্পূর্ণ না হলেও পংক্তি কিংবা শব্দবিশেষ মানুষ বিস্মৃত হয়ে যায়। তারপরে ছন্দ বজায় রেখে বিস্মৃত অংশ নিজের পছন্দমত শব্দ বা চরণে পূরণ করে নেয়। এই ব্যাপারে অবশ্য নারীদেরই বিশেষভাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। কারণ পূর্বে আমাদের সমাজে প্রচলিত ছিল গৌরীদান প্রথা। অল্প বয়সেই মেয়েদের বিবাহ দেওয়া হ'ত এবং অনেক ক্ষেত্রেই তা দেওয়া হ'ত দূর-দূরান্তরে। এইভাবে কন্যা—বিবাহসূত্রে পিত্রালয়ে শোনা ছড়া স্মৃতি-সূত্রের মাধ্যমে শ্বশুরালয়ে নিয়ে উপস্থিত হত। এক্ষেত্রে ছড়াগুলি একান্ত-ভাবে স্মৃতিবাহিত হবার ফলে স্বাভাবিক কারণেই কিছু কিছু অংশ বিস্মৃতির গহ্বরে নিমজ্জিত হত এবং পরিবর্তিত হত। নূতন স্থান এবং পরিবেশেরও ছড়ার পরিবর্তনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা থাকত। বিশেষতঃ ছড়ার ক্ষেত্রে এই যুক্তি প্রযোজ্য হবার কারণ হল এই যে ঘুমপাড়ানি, ছেলে ভুলান, স্নান করান প্রভৃতি দায়িত্বগুলি বিশেষভাবে নারীদের ওপরেই ন্যস্ত। তাই অল্প-বয়সী কন্যারা তাদের শৈশবে ও বাল্যে জননী অথবা জননী-স্থানীয়াদের মুখ নিঃসৃত এইসব বিষয়ক ছড়াগুলির সঙ্গে গভীরভাবে পরিচিত হবার সুযোগ পেত, যা পরবর্তীকালে তাদের গার্হস্থ্য জীবনেও কার্যকরী হত অনেকখানি!

ছড়ার পাঠান্তরের ব্যাপারে অপত্যস্নেহও অনেকখানি দায়ী। কারণ স্নেহময়ী জননী ছড়ার মাধ্যমে আত্মজ সন্তানের প্রতি অন্তরের অন্তহীন স্নেহকে প্রকাশ করতেন। ফলে সব সময় প্রচলিত ছড়ার গতানুগতিক বক্তব্য কিংবা উপমায় অনেক সময় তাদের মন ভরত না। নিজেদের অভিরুচি অনুযায়ী অনেক ক্ষেত্রেই তাঁরা নতুন নতুন বক্তব্য কিংবা বক্তব্য প্রকাশের উপযোগী শব্দ নিজেরা সৃষ্টি করে নিতেন। যেমন আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ সংগৃহীত এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত [১৩০৯] নিম্নোক্ত ছড়াটি—

আয়্ চান্দ আয়্ আয়্।
আইলা দেম্ বাইলা দেম্,
মাছ কুটি মেজা দেম্,
চূড়া ঝাড়ি কুরা দেম্,

কলাছুলি বাকল দেম্

চান্দ্ কপালে পুড়ুস ॥

পরিবর্তিত হয়ে দাঁড়ায়—

আয়্ চান্দ আয়্ চান্দ্ ।

কলা দিম্ মোলা দিম্ ;

ধেয়ন গাইয়র দুধু দিম্

গাইয়র্ নাম চুঙুরী,

ডেকার নাম ভুঙুরী ॥ পুড়ুস্ ॥

বিপরীতক্রমে অনেক ছড়া শিশুরাও আবৃত্তি করে আনন্দ পায়। উচ্চারণের দৌর্বল্যহেতু তারাও অনেক সময় শব্দ বা বাক্যাংশ বিকৃত অথবা পরিবর্তিত রূপে উচ্চারণ করে। ছড়ার পাঠান্তরের এও আর এক কারণ। যেমন নিম্নের এই ছড়াটি—

তাই তাই তাই ।

মামার বাড়ীত্ যাই ॥

মামারত্ আছে টুন্যা ভাই ।

সঙ্গে খেলা খাই ॥

ও দুধে ভাতে খাই ।

চল মামার বাড়ীত্ যাই ॥

পরিবর্তিত হয়ে দাঁড়াল—

তাই তাই তাই ।

নানার বাড়ীত্ যাই ॥

হাম্বার দুধু খাই ।

হাম্বার দুধু ন দিলে,

হাতুয়া ভাঙি ধাই ।

তবে ছড়ার মূল পাঠ কোনটি এবং কোনগুলিই বা পাঠান্তর তা নিশ্চয় করে জানার কোন উপায় নেই। তাই ছড়ার সব ক'টি পাঠই গুরুত্বপূর্ণ, সব পাঠই সংগ্রহযোগ্য।

বাংলা লোক সঙ্গীতের অ সাম্প্রদায়িক চরিত্র

বাংলা লোক-সঙ্গীত সংহত সমাজের সৃষ্টি; শুধু সংহত সমাজের সৃষ্টি নয়, সংহত সমাজের জন্যে সৃষ্ট। তাই বিষয়বস্তু নির্বিশেষে আমাদের লোক-সঙ্গীত সংহত সমাজের দ্বারা আদৃতও হয়েছে। আমাদের সমাজের অন্তর্গত হলেন মুখ্যতঃ হিন্দু এবং মুসলমান। তাই সংহত সমাজের সৃষ্ট লোক-সঙ্গীতে হিন্দু এবং মুসলমান ধর্মসম্প্রদায়ের নিজস্ব কিছু কিছু বিষয় স্থান পেয়েছে সত্য, কিন্তু ততোধিক সত্য হ'ল উভয় সম্প্রদায়ই পরস্পর পরস্পরের সৃষ্ট সম্পদকে আন্তরিক ভাবে গ্রহণ করেছেন। আসলে আমাদের তথাকথিত শিক্ষিত সমাজে সাম্প্রদায়িক ভেদ বুদ্ধি যতটা প্রকট, নিরক্ষর মানুষের ঐক্যবদ্ধ সমাজে সেই ভেদ বুদ্ধি ততটা প্রকট নয়। একই প্রাকৃতিক পরিবেশে, প্রায় একই রূপ জীবিকার অধিকারী হয়ে, একই ধরণের ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী এইসব মানুষ 'আজান' এবং 'হরিধ্বনি'কে সমান পবিত্র বলেই মানেন। এখানে পীরের দরগা এবং দেবতার পবিত্র স্থানের মধ্যেকার ব্যবধান খুবই কম। বাংলার লোক-সঙ্গীতে তাই সম্প্রদায় বিশেষের নিজস্ব ভাবনা-চিন্তা কিংবা বিশ্বাসের প্রতিফলন যাই ঘটে থাকুক শেষ পর্যন্ত তা অ-সাম্প্রদায়িক সৃষ্টিতে রূপান্তরিত হয়েছে। বিভিন্ন শ্রেণীর লোক-সঙ্গীতে কতখানি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কথা অভিব্যক্ত হয়েছে সেই বিষয়ের আলোচনাতেই নিবন্ধটির সূত্রপাত।

আমাদের সাম্প্রদায়িক পরিচয়ের মূলে থাকে বিশেষ কোন ধর্মের প্রতি ঐকান্তিক বিশ্বাস ও আস্থা। আমরা বিশেষ যে ধর্মে আস্থাশীল, অনেক ক্ষেত্রেই সেই ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করতে অন্য ধর্মকে ছোট করে দেখি, তুচ্ছ করে দেখি অন্য ধর্মে বিশ্বাসী মানুষদেরও। আসলে অন্ধ বিশ্বাস প্রশ্রয় দেয় যুক্তিহীনতাকে আর যুক্তিহীনতা আহ্বান করে আনে অর্থহীন সংস্কার এবং সংকীর্ণ ভেদবুদ্ধিকে।

পরম পুরুষ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ জলের উপমা দিয়ে সব ধর্মের শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকার করে নেবার পরামর্শ দিয়েছিলেন। স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন সব ধর্মেরই তুল্য মূল্যের কথা। তবু অন্ধ ধর্মীয় বিশ্বাস আজ বিংশ শতাব্দীতেও, বিজ্ঞানের চরম অগ্রগতির দিনেও বীভৎস রূপে আত্মপ্রকাশ করে আমাদের তথাকথিত সভ্যতার আবরণের ভেতরকার উৎকট রূপটিকে দেখিয়ে দেয়। কিন্তু আজ থেকে বহুকাল আগে সৃষ্ট লোক-সঙ্গীতে অর্থহীন সংকীর্ণ ধর্মান্ধতার পরিবর্তে যে স্বচ্ছ ও উদার মানসিকতার পরিচয় প্রতিফলিত হয়েছে তা আমাদের একদিকে যেমন করে বিস্মিত, তেমনি সেই সঙ্গে আমাদের লোক-কবিদের সম্পর্কে করে তোলে শ্রদ্ধাশীল। উত্তরবঙ্গের একটি ভাওয়াইয়া গানে বিভিন্ন দিকে প্রণাম নিবেদন প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ

আমরা পছিমে বন্দনা করি গো
আমরা আল্লাবী-ধাম।
তাহারি কারণে তাহারি চরণে
আমরা জানাইলাম সেলাম।
আমরা উত্তরে বন্দনা করি গো
ঐ না দেবী মায়ের চরণ,
তাহারি কারণে আমরা জানাইলাম প্রণাম।
আমরা পূরব বন্দনা করি গো
ঐ না ধর্ম নিরঞ্জন,
তাহারি চরণে আমরা জানাইলাম সেলাম।
আমরা দক্ষিণে বন্দনা করি গো

ঐ না ক্ষীর নদী-সাগর,
সেখানে হারাইছে সেরা আলি খেলাড়ি পাথর ॥

পশ্চিম দিক 'আল্লার ধাম' বলে যেমন সেই দিকের উদ্দেশে লোক-কবির সেলাম নিবেদিত হয়েছে, তেমনি আবার উত্তরে 'দেবী মা'য়ের চরণের প্রতিও কবি তাঁর প্রণাম জানিয়েছেন।

মুর্শিদাবাদের একটি বাউল গানে আল্লা এবং হরি যে মূলতঃ এক, উভয়ের অস্তিত্ব সম্পর্কিত সর্বপ্রকার সংশয় যে অর্থহীন, আন্তরিক ভাবে যাঁরই স্মরণ নেওয়া যায়, তাঁরই করুণায় চিরবাঞ্ছিত অরূপ রতনের সন্ধান লাভ ঘটে- এই সত্যটিকে প্রকাশ করে বলা হয়েছে :

ভোলা মন আমার, কেন তুমি অচেতন,
ও তোমার মনের কোণে সন্দেহ যে অকারণ ॥
কেবা আল্লা কেবা হরি ভাব তুমি অকারণ।
সেই দীননাথ ভবের কাণ্ডারী,
ও মন, যারে ভজ তারেই পাবে মিলবে তোমার অরূপ ধন ॥

যথার্থ ভক্তি মার্গের পথিক যিনি, তিনি জানেন রাম-রহিমে কোন ভেদ নেই। আল্লা এবং হরিকে আমরা যতই কেন রূপগত বিচারে পৃথক করে দেখি স্বরূপে উভয়েই এক। একটি গাজীর গানে লোক-কবি আমাদের চেতনার রাজ্যে সত্যের সেই মর্মবাণীকেই উপস্থিত করেছেন :

মুসলমানে বলে গো আল্লা হিঁদু বলে হরি,
নিদানকালে যাবেরে ভাই একই পথে চলি (রে)
দোয়া-নি করিবা আল্লারে।

মুসলমান সমাজের ফকির সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত গানেও এই একই সত্য অভিব্যক্ত হয়েছে। সেই সঙ্গে অজ্ঞ ও ধর্মান্ধ মানুষ ধর্ম অথবা ঈশ্বর নিয়ে অর্থহীন যে দ্বন্দ্বের অবতারণা করে, ভক্ত কবির কাছে তা যে কতখানি মূল্যহীন, পরম সত্যকে যিনি একবার অন্তরে উপলব্ধি করেছেন, তাঁর কাছে কোন প্রকার জাগতিক সংস্কারই যে বড় হয়ে দেখা দিতে পারে না তার পরিচয়ও বর্তমান ফকিরী গানটিতে পাওয়া যায়—

আমি তোমার কাঙালী গো সুন্দরী রাধা
আমি তোমার কাঙালী গো
তোমার লইগ্যা কাইন্দা ফিরে
হাছন রাজা বাঙালী গো।
হিন্দুরা বলে তোমায় রাধা,
আমি বলি খোদা,
রাধা নামে ডাকলে
মুল্লা মুন্সীরে দেয় বাধা।
হাছন রাজা বলে আমি না রাখিব জুদা,
মুল্লা মুন্সীর কথা যত সকলই বেহুদা।

মালদহের একটি গম্ভীরা গানে শিবকে উদ্দেশ করে বলা হয়েছে যে তাঁর উপস্থিতি সর্বত্র, কখনও বা তিনি মক্কাবাসী আবার কখনও তিনি শ্মশান-বাসী, কখনও আবার কালীর পাটে তাঁর অবস্থান—

বুড়া ভারী ঘুস্কিছিলান থাকে সব ঘটে,
কখন দেখি মক্কা, কাশী কখন শ্মশানঘাটে,
কখন কালীর পাটে,
(ও) বুড়া হোয়্যা কাজি, মক্কার হাজী আছে আঁড়্যাতে চড়্যা॥

নদীয়া থেকে সংগৃহীত একটি বাউলগান এবারে উদ্ধার করা গেল যে গানে পরম শক্তিমান ঈশ্বরকে জগৎ-সংসারের সবকিছু বলে অভিহিত করা হয়েছে। ঈশ্বর নিজেই ভাল, নিজেই মন্দ, তিনি কৃষ্ণ, তিনিই কালী, তিনি সৃষ্টির সর্বত্রই বিরাজমান, সর্বরূপে তাঁর স্থিতি, এমন কি তিনিই মুসলমান।

যে ভাবেতে রাখেন গো, সাঁই, আমি সেই ভাবে থাকি।
অধিক আর বলব কি॥
কখনও দুগ্ধ চিনি, ক্ষীর ছানা মাখন ননী,
কখনও নুন আমানী, কখনও আলবুলো শাক ভূকি॥
কুল আলম তোমারি ওহে কুদরুত নিহারী,
তুমি কালী, তুমি কৃষ্ণ, তুমি হক বারী,

তুমি দাও, তুমি দেলাও, তুমি খাও তুমি খেলাও,
তৈয়ারী ঘর ছেড়ে তুমি পালাও, আমারে ঘুরাচ্ছ দিয়ে ফাঁকি ॥
তুমি সর্ব ঘটে রও, তুমি সর্বরূপ হও,
ভালকথা মন্দকথা, সকল তুমি কও।
তুমি হও রোগীর ব্যাধি, তুমি বৈদ্যের ওষধী
তুমি গো সকল জীবের বল বুদ্ধি,
তোমার ভাব বুঝা বাঁকা ঠকঠকী।
ভবে দুঃখ দিতে তুমি, ভবে সুখ দিতে তুমি,
মান অপমান তোমার হাতে, সুনাম বদনামী।
কয়ছে বিন্দু যাদু, দয়াল, তুমি চোর তুমি সাধু,
দয়াল গো, তুমি মুসলমান হিন্দু,
আমি সে কুবির চাঁদ বলে ডাকি ॥

অর্থাৎ ঈশ্বরের কোন বিশেষ জাত নেই, তিনি সকল জাতের উর্ধ্বে। অথবা তিনি সব জাতের মধ্যেই বিদ্যমান।

আর একটি বাউল গানে উল্লিখিত হয়েছে যে ভগবান তাঁর ভক্তদের বিচার করেন ভক্তির নিরিখে, জাতের নিরিখে নয়। কথায় বলে ভক্তের ভগবান—অতএব ভক্তিই হবে ভক্তের একমাত্র শক্তি যা তাকে ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভে সহায়তা করবে—

ভক্তের প্রেমে, ওগো, বাঁধা আছে সাঁই
হিন্দু কি মুসলমান বল্যা
তার জাতের বিচার নাই।
ভক্ত ছিল কবীর জোলা ও যে পাইয়াছে ব্রজের কালা
ও তার সাধন জোরে পায়।
দেশে রামদাস মুচি ছিল সাধনে তার বুদ্ধি সিদ্ধ হৈল
ও আমি শুনি গুরুর ঠাঁই ॥

জীব মাত্রেরই শেষ পরিণাম মৃত্যু। অতএব বিষয় বাসনায় নিমজ্জিত থাকলে এবং সময়মত সাধনমার্গের সন্ধান লাভে বঞ্চিত হলে পরিণামে

অন্তহীন দুঃখ ভোগের সম্মুখীন হতে হয়। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলকে তাই সদ্‌গুরুর শরণ নিতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে—

ও চাঁদ-বদনে বল, ও গোঁসাই,
ও বান্দার এক দোমের ভরসা নাই।
আপন বাড়ী আপন বিষয়
সদাই রবে, দিন গেলরে আমার॥
বিষয় বিষ খাবি যেদিন হারাবি
এখন কাঁইদলে কি আর পাবি ভাই॥
চাঁদ বদনে বল ও গোঁসাই॥
কিবা হেন্দু যুবনের চেলা
পথের পথিক চিনে ধর এই বেলা
পিছে কাল শমন ধইরবে তখন বিপদ ঘটিবে ভাই॥
চাঁদ বদনে বল ও গোঁসাই॥

এই মানব দেহভাণ্ডকেই বাউল সাধকেরা ব্রহ্মাণ্ডরূপে কল্পনা করেছেন। সাধনার জন্যে তাই বাউল সাধক অন্যত্র যাবার প্রয়োজন বোধ করেন না— এমন কি তীর্থক্ষেত্র বলে পরিচিত স্থানেও নয়। আমাদের দেহ যে পাঁচটি উপাদানে তৈরী, তা হল ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ এবং ব্যোম। মৃত্যুর পর এই পঞ্চভূতে জীব বিলীন হয়ে যায়। কিন্তু কই এই সব উপাদান গুলির তো পৃথক কোন জাতিগত পরিচয় নেই। সব মানুষের ক্ষেত্রেই উপাদানগুলি এক। তাই মুর্শিদাবাদ জেলার একটি বাউল সঙ্গীতে দেহসাধনার কথা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ

ও মন পাগলারে, তোর দেহের মধ্যে কত রং দেখরে চেয়ে।
এই যে দেহেতে আছে তারা পঞ্চ ভাই (আছে তারা পঞ্চ ভাই)
ওরা হিন্দু কিংবা মুসলমান পরিচয়ও নাই।
এই যে দেহেতে আজ নব নব নারী (আছে নব নব নারী)
দিন থাকিতে চিনে লও, মন, কার কোন বাড়ী।
এই যে দেহেতে আছে আছে গয়া গঙ্গা কাশী (আছে গয়া গঙ্গা কাশী)

বৃন্দাবনে কানাইয়া রাজার মোহন বাঁশী।

এইবার হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতি নিয়ে রচিত কয়েকটি গান নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন যে বাংলা লোক-সঙ্গীত প্রায় সবই ধর্মকেন্দ্রিক। এর কারণ আমাদের সংহত সমাজজীবনের আদ্যন্ত ধর্মীয় আচার-আচরণ-অধিকার করে আছে। অবশ্য বাংলার লোক-সঙ্গীত সাধারণভাবে ধর্মকেন্দ্রিক হলেও এমন মনে করার কারণ নেই যে সমস্ত লোক-সঙ্গীতেই গভীর অধ্যাত্ম ভাব প্রকাশিত। বরং অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যাবে ধর্মীয় আধারে সংহত সমাজ জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, ব্যর্থতা-নৈরাশ্য, আনন্দ-দুঃখই বেশি করে স্থান লাভ করছে। লোক-সঙ্গীত লোক-কবিদের আন্তরপ্রেরণাতেই রচিত, তাই এই সঙ্গীতের বক্তব্যে কোনপ্রকার কৃত্রিমতার স্থান নেই। লোক-কবিরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে গানগুলি রচনা করেছেন, কেউ বাইরে থেকে জোর করে সঙ্গীতের বিষয়বস্তু চাপিয়ে দেয় না বা এই ব্যাপারে নির্দেশ দানেরও কোন প্রশ্ন ওঠেনা। তাই লোক-কবিরা যখন হিন্দু-মুসলমানের বিরোধে ব্যথিত হয়ে নিজেদের অন্তরের বেদনা প্রকাশ করেন কিংবা এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যেকার বাঞ্ছিত সম্প্রীতির জন্য আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন, তখন তা স্বভাবতই আমাদের অন্তরকে স্পর্শ না করে পারেনা।

পুরুষানুক্রমিক ভাবে যে বাস্তুভূমিতে মানুষ বাস করত, সাম্প্রদায়িক গোলযোগের পরিপ্রেক্ষিতে সেই বাস্তুভিটা ত্যাগে উদ্যত এবং বাস্তুভিটা ত্যাগী মানুষদের জন্যে একটি জারি গানে কি আন্তরিক দুঃখই না প্রকাশিত হয়েছে, সেই সঙ্গে বাস্তুত্যাগী মানুষদের প্রতি করুণ অনুরোধ উচ্চারিত হয়েছে যেন পিতৃপুরুষদের ভিটা ত্যাগকরা না হয়—

স্বাধীন দ্যাশে লোক পালাইল
এমন খবর শোনছ নি ?
বাপ দাদার ওই ভিটা ছাইড়্যা,
চলছে সব বিদ্যাশে কি ?
হিন্দু-মোছলমান একই জাত ভাই,

একই দ্যাহের দুইডা হাত,
কেউ কারু নয় শত্তুররে ভাই,
দুইয়ে, দুইয়ে মিত্তির হয়।
রোজ সকালে আজান গান,
আর বেরাম্ভনের মোন্তর পাঠ,
সন্ধ্যাকালে নেমাজ পড়ে,
কুলনারী পীদ্‌র্ম দ্যায়,
এক সাথেতে রইছি মোরা,
এক সাথেতে করছি খেলা,
একই সঙ্গে চলছি ফিরছি
এখন ক্যানে ভিন্ন ভাব ?
(ও ভাই) পরের কথায় পরের ভরসায়
ছাইড়ো না দ্যাশ মাথা খাও।

মালদহের গম্ভীরা গানে সাম্প্রদায়িক ঐক্যের কথা বড় বেশী করে স্থান পেয়েছে লক্ষ্য করা যায়। একটি গম্ভীরা গানে শিবের কাছে দুঃখ করে বলা হয়েছে, যে হিন্দু-মুসলমান গভীর সম্প্রীতির সঙ্গে বসবাস করত এবং পূজার্চনায় অংশ গ্রহণ করত, এখন সেই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে কতই না অকারণ বিরোধ যার পরিণামে দুই সম্প্রদায়ের মানুষকেই ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে—

হায়রে আল্লা কি হোল, হিন্দু-মোসলেম দুই মোলো।
দেখছি জাতিয়ারী জাতিয়ারী কোর‍্যা দাঙ্গা-হাঙ্গামায় পোল ॥
মোসলেম কোহছে হাম বাড়া, হিন্দু দেয় নাকো সাড়া।
ভোলা তোমার দেশে একুন ভেসে দোটানা ভাব দাঁড়ালো ॥
ভোলা তুমি মুসলমানের আদব, হিঁন্দুর শিব শিব বোম্ বোম্।
হামরা দুয়োভায়ে করতুক পূজা
মানধোৎ কি মজা ছিল ॥

অন্য গানেও ধর্ম নিয়ে অহেতুক বিবাদ-বিসম্বাদ সম্পর্কে একই সঙ্গে দুঃখ এবং ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়েছে—

ধর্মের যাই বলিহারী, ধর্ম্ম লিয়া চল্‌ছে কিসের এত আড়াআড়ি।
আল্লা ঢাকের বোলে চট্টি তোলে আজানে কীষ্ট পালায় ॥
কুণ্ঠে আল্লা ভগবান, কুণ্ঠে আছে আল্লের থান,
মন্দিরে কি মসজিদেতে পূজা সিন্নি খান,
তোমার নূরেতে কি টিকিতে ব্যোসা তসবীর কি মালা ঘুরায় ॥
শুন্যাছি যবন হরিদাস, ছিল চৈতন গোঁসার দাস,
হরি-আল্লা একই ভাব্যা নদ্যাৎ করলে বাস,
শ্যাষে কাজীর বিচার হার মান্যাছে, দেখ্যা অর উপাসনায়।

আপাত দৃষ্টিতে দুই জাতির মধ্যেকার যত পার্থক্যই দৃষ্টিগোচর হোক, আসলে যে দ্বি-জাতি তত্ত্বের কোন ভিত্তি নেই, সেই প্রসঙ্গে লোক-কবি নিজের উপলব্ধিজাত কয়েকটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করে বলেছেন—

যত ওপরে যাব ভাই, জাত কোহতে কিছুই নাই,
একের জন্য সবাই পাগল, একে চাহে সবাই,
যত নীচের পাগল হোয়্যা ছাগল ধর্মেতে শুধু ধাঁধায় ॥
চাঁদ সূরুজ তোমার এক, নদী, বাতাস, আগুন এক,
দুনিয়ার মানুষ দেখ্‌ছে শুন্‌ছে খাছে পিছে,
ঐ এক জনারই সিজ্জন করা সারা দুনিয়ায় একজনাই ॥

শেষ পর্যন্ত উভয় সম্প্রদায়ের বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্যে শিবের কাছে আন্তরিক ভাবে আবেদন জানিয়ে বলা হয়েছে—

শিব মিটাও গণ্ডগোল, লাগাও আজান, ঢাক আর ঢোল,
আল্লা—আল্লা, হরি—হর ধর সবাই বোল,
একলা খলিফা শমীরকে হাজির রাখো তোমার গম্ভীরায় ॥

বাংলা লোক-সংগীতে সমসাময়িক জীবন ও প্রতিক্রিয়া

লোক-সাহিত্য সম্পর্কে কোন কোন মহলে এমন একটা অভিযোগ শুনতে পাওয়া যায় যে এর উপাদান নাকি সবই বিগত দিনের। অর্থাৎ লোক-সাহিত্য বর্তমানকে স্বীকার করেনা, অতীতের বিষয়বস্তুর সঙ্গেই এর সম্পর্ক। আর এই কারণে এই রকম সিদ্ধান্তও করা হয়ে থাকে যে লোক-সাহিত্য বৈচিত্র্যহীন, যুগের পরিবর্তনকে স্বীকার না করে নেওয়ার ফলে এই সাহিত্য ঠিক আধুনিক পদবাচ্য হবার যোগ্যতা লাভের অধিকারী নয়। লোক-সাহিত্য সৃষ্টির পথ অবরুদ্ধ, এমন কথাও বলতে শোনা যায়। একথা ঠিকই যে সাহিত্যের সজীবতা নির্ভর করে যুগের চলমানতাকে স্বীকার করে নেওয়ায়। যে সাহিত্য সমসাময়িক জীবনকে স্বীকার করেনা বা সমসাময়িক জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যা যুক্ত, তাকে অস্বীকার করে, সেই সাহিত্যের অগ্রগতি ব্যাহত হতে বাধ্য। যথার্থ সাহিত্যকে অনেকগুলি দাবী মেটাতে হয়—তার মধ্যে একটি হল—তা অবশ্যই সমসাময়িক জীবনকে প্রতিফলিত করবে। লোক-সাহিত্যও সর্বোপরি সাহিত্য, তাই সমসাময়িক জীবন তথা যুগকে বিশ্বস্তভাবে চিত্রিত করার দায় লোক-সাহিত্যেরও। আর বলা বাহুল্য এই দায় মেটাবার পরিচয় যদি আমরা লোক-সাহিত্যে পাই, তাহলে কোনমতেই আমরা তাকে বৈচিত্র্যহীন বলে অভিহিত করতে পারিনা কিংবা পারিনা লোক-সাহিত্য রচনার ধারা স্তব্ধ—একথা বলতে। এই পরিপ্রেক্ষিতেই বর্তমান প্রবন্ধের

স্বল্প পরিসরে আমরা লোক-সাহিত্যের বিস্তৃত ক্ষেত্র থেকে কেবল বাংলা লোক-সঙ্গীতের কিছু পরিচয় গ্রহণের চেষ্টা করব।

একথা ঠিকই যে বাংলা লোক-সাহিত্যের সিংহ ভাগ অধিকার করে আছে ধর্ম এবং ধর্ম সংক্রান্ত কাহিনী, চরিত্র ইত্যাদি বিষয়। গতানুগতিক তথা প্রথাসিদ্ধ বিষয়ও বাংলা লোক-সঙ্গীতে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই সঙ্গে সমসাময়িক কালের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক জীবনের স্বাক্ষর বহন করছে—এমন লোক-সঙ্গীতের সংখ্যাও খুব কম নয়। আমাদের গ্রাম বাংলার সংহত সমাজের তথাকথিত নিরক্ষর মানুষগুলির যুগচেতনার পরিচয়বাহী কয়েকটি সংগীতের উল্লেখ করে আমরা দেখাতে প্রয়াস পাব যে, আমাদের লোক-সংগীতের ধারা কত সজীব, আর সেই সঙ্গে আমরা উপলব্ধি করতে পারব যে লোক-সাহিত্য সৃষ্টির ধারা ব্যাহত হবার নয়। চলমান জীবনের সব কিছুকে শুধু আয়ত্ত নয়, আত্মস্থ করে, নিত্য নুতুন উপকরণে সমৃদ্ধ হয়ে তার যাত্রা এখনও সমান গতিশীল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশের সর্বাপেক্ষা যে গুরুত্ব-পূর্ণ সামাজিক আন্দোলনটির সঙ্গে সমাজ সংস্কারক পুণ্যশ্লোক পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নামটি গভীরভাবে যুক্ত এবং যে আন্দোলন সমগ্র বাঙ্গালীর জীবনে সৃষ্টি করেছিল এক তীব্র আলোড়ন—তা হ'ল বহু বিতর্কিত বিধবা-বিবাহ আন্দোলন। বিদ্যাসাগরের পূর্বেই এই আন্দোলনের সূত্রপাত, কিন্তু এই আন্দোলন তীব্র হয়ে ওঠে এবং শেষ পর্যন্ত আইনগত স্বীকৃতি লাভ করে বিদ্যাসাগরেরই দুর্দমনীয় প্রয়াসে। সে যুগে বিধবা-বিবাহ আন্দোলন এবং এই ব্যাপারে বিদ্যাসাগরের ভূমিকার পক্ষে-বিপক্ষে তীব্র জনমত সৃষ্টি হয়েছিল। একটি লোক-সংগীতেও এই বিষয়টি স্থান পেয়েছে এবং সংগীতটিতে বিদ্যাসাগরের প্রয়াসের প্রতি সমর্থন জানান হয়েছে। সেদিনের পল্লী-বাংলার সংহত সমাজ বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ সংক্রান্ত প্রয়াসকে কিভাবে গ্রহণ করেছিল, সংগীতটি তারও এক গুরুত্বপূর্ণ দলিল নিঃসন্দেহে—

ওরে বিদ্যেসাগর দিবে বিয়ে
বিধবাদের ধরে,

তারা আর ফেলবেনা চুল,
বাঁধবে বেণী গুঁজবে রে ফুল,
শাঁখা শাড়ী পরবে নতুন করে।
হায়রে ঐ বেজো মণ্ডল,
বেটা বলবে নেহাৎ গাঁড়ল,
শয়তানি সব যাবে চুলোর দোরে।
বেটা বলে কিনা বিদ্যেসাগর নিরেট বোকা,
একেবারেই মাথা মোটা,
নইলে বিধবাদের এমনি করে,
বসাতে চায় আদর করে॥
দেখরে বেটা চেয়ে এবার,
নতুন কনে চলল সেজে নতুন বরের ঘরে,
উলু দেওগো জননীরা বধূ নেওগো ঘরে,
ঘষা সিঁথে নতুন করে সিঁদুর দেওগে ভরে॥

স্বভাবধর্মে মানুষ গতানুগতিকতায় অধিকতর আস্থাশীল, এমন কি এক্ষেত্রে যুক্তির দ্বারা চালিত হতেও মানুষের আপত্তি লক্ষিত হয়। আর এ ব্যাপারে শিক্ষিত এবং অশিক্ষিতের পার্থক্য যৎসামান্যই। দীর্ঘদিনের প্রচলিত রীতি-নীতিকে বাদ দিয়ে সেই স্থানে নূতনকে স্বীকার করে নেওয়া অনেকের পক্ষেই সহজসাধ্য নয়। এমনটিই ঘটেছিল ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে তদানীন্তন ভারতসরকার কর্তৃক প্রবর্তিত নূতন মুদ্রার প্রচলনে। দীর্ঘদিন পর্যন্ত আমাদের দেশে ষোল আনায় টাকা এই হিসাব চলে এসেছে। কিন্তু ১৯৫৭ সাল থেকে মুদ্রার ক্ষেত্রে যখন দশমিক হিসাবকে স্বীকার করে নেওয়া হল, তখন দেশের বহু মানুষই এই নতুন হিসাব-ব্যবস্থাকে সহজে মেনে নিতে পারেন নি। বেশ কিছু লোক-সংগীতে আমাদের গ্রাম বাংলার মানুষের মানসিকতার প্রতিফলন ঘটেছে এই প্রসঙ্গে এবং অবশ্যই সেই মানসিকতা পরিবর্তিত হিসাব নীতির প্রতিকূলেই—

স্বাধীন ভারত নূতন পয়সা হবে গুণিতে।

যত আছে মূর্খলোক, তাদের হইল দুঃখ !
এইবার হাট বাজার পারিবে না করিতে ॥
ষোল আনা ছিল জানা, সেটা করিল মানা !
একশ পয়সায় একি টাকা, পারিবে কি গুণিতে
লেখাপড়া কর সবাই চিনিবে গো একেলাই।
এই ভারতে লেখাপড়া হবে এবার শিখিতে ॥
এক দু আনা ভাঙ্গিলে, টাকাই আনা যায় চলে।
ঐ রাগে যাও স্কুলে বলিছে জগন্নাথে ॥

একটি গম্ভীরা গানেও নয়া পয়সার বিষয়টি উল্লিখিত হয়েছে—

লয়্যা পয়সা উঠিয়্যা নানা বাঁধাল জঞ্জাল
একশ পয়সায় এক টাকা একি বা ভাজাল
কিনাবেচার বেলায় গোলমাল
হামরা চাষার বেটা, এ কোণ ল্যাঠা, হিসাব বুঝব
কেমন কর‍্যা ॥

১৯৬৩ সালে তৎকালীন ভারত সরকার কর্তৃক স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণ আইন প্রবর্তিত হয়। এই আইনে বাইশ ক্যারেটের সোনার পরিবর্তে চোদ্দ ক্যারেটের স্বর্ণালঙ্কার নির্মাণের আদেশ জারি করা হয়। সে সময়ে এই আইনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছিল। বিশেষত এই আইন প্রবর্তনের ফলে স্বর্ণকারদের জীবিকায় টান পড়ে। বহু স্বর্ণকার এই সময় আত্মহত্যা করেন, অনেকেরই জীবিকা বন্ধ হয়ে যায়। পূর্ববঙ্গের একটি 'বয়াতী'র গানে এই স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণ বিষয়কে উপজীব্য করা হয়েছে—

ও আমার দ্যাশের কথা বলব কি তা শোনরে সাধু ভাই,
ও হেথায় বুদ্ধিমানের রাজত্বেতে বলার কিছু নাই।
ও ছিল সোনার অলঙ্কার, ও তায় পিতল দিয়ে দেয়,
সোনারূপো কেড়ে নিয়ে শেষে পিতলে চোখ বাঁধায়।
কত লক্ষ লক্ষ মানুষ ছিল সোনার কারিগর,
নয়া আইনে কাবু হইয়া হইল দিগম্বর।

বেকার হইল কর্ম্মকার,
ক্ষুধার জ্বালায় ক্ষিপ্ত হইয়া আর্সেনিকে দেয় চুমুক,
অধম নিবারণ কয় বিনয় করি সরকার মশাইর
চোখ খুলুক।

বিহার রাজ্যের দক্ষিণপূর্ব সীমান্তে অবস্থিত মানভূম জেলা ১৯১১ সাল পর্যন্ত বৃহত্তর বঙ্গ দেশেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৯১১ সালে তৎকালীন ইংরেজ সরকার অবিভক্ত বাংলা দেশের পশ্চিমাংশ থেকে মানভূম, সাঁওতাল পরগণা ও পূর্ণিয়া জেলা নিয়ে বিহারের সঙ্গে যুক্ত করে দেন। স্বভাবতঃই মানভূম-জেলার অধিবাসীরা পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত হবার ন্যায্য দাবী জানাতে থাকেন। এরই ফলে 'রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন' ১৯৫৬ সালে ইংরেজ আমলের বিহার রাজ্যের দক্ষিণ পূর্ব সীমান্তের মানভূম জেলাকে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত করে দেন। মানভূম পশ্চিমবঙ্গের ষোড়শতম জেলায় পরিণত হয় এবং 'পুরুলিয়া' এই নামে পরিচিত হয়। বলা বাহুল্য, প্রতিবেশী বিহার রাজ্য থেকে মানভূমের পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্তি খুব সহজে সাধিত হয় নি। এজন্যে অনেক আত্মত্যাগ ও কৃচ্ছ্রসাধন করতে হয়েছে এই জেলার মানুষকে। একটি টুস্নু গানে মানভূমের মানুষের বাংলা ভাষাকে তাদের মাতৃভাষারূপে স্বীকারের দাবী ঘোষিত হয়েছে। অনায়াসে অনুমান করা চলে যে গানটি ১৯৫৬ সালের পূর্ববর্তীকালে রচিত, যখন মানভূম ছিল বিহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত এবং মানভূমের মানুষের ওপর বলপূর্বক হিন্দী ভাষাকে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল—

আমার বাংলা ভাষা প্রাণের ভাষারে
(ও ভাই) মারবি তোরা কে তাকে ?
বাংলা ভাষারে ॥
এই ভাষাতেই কাজ চলেছে
সাতপুরুষের আমলে।
এই ভাষাতেই পরচা রেকর্ড
এই ভাষাতেই চেক কাটা

এই ভাষাতেই দলিল নথি
সাতপুরুষের হক পাটা ॥
দেশের মানুষ ছাড়িস যদি
ভাষার চির অধিকার,
দেশের শাসন অচল হবে
ঘটবে দেশে অনাচার ॥

ভারতবর্ষ পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। এখানে বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা সবই নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা পরিচালিত হয়। এ দেশের মানুষের সঙ্গে তাই ভোট বা নির্বাচনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। একটি টুসু গানে স্থান পেয়েছে এই নির্বাচনের কথা—

আমার টুসু ভোট দিচ্ছে
ইঞ্জিনিয়ারের ইঞ্জিনে,
নিমির টুসু ভোট দিচ্ছে
কাঁচা কয়লার গোদামে ॥

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক জমিদারী অধিগ্রহণ বিলের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত একটি গম্ভীর গানেরও উল্লেখ করা গেল—

জমি বেচতে জোতদারের দালাল বেড়ায় ঢুঁর‍্যা,
থাকবে না আর জমি-জমা নিয়ে লিবে কার‍্যা,
গাঁ হাক পাছে না ছুনিয়া ঢুঁর‍্যা,
এখন গালে দিয়া হাত, প্যাটে যায় না ভাত, থ্যাকছে
বিছানায় পড়্যা ॥

স্পষ্টতঃই গানটিতে জমিদার এবং জোতদারদের প্রতিক্রিয়া চিত্রিত হয়েছে জমি হারাবার সম্ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে। শুধু জমিদারী অধিগ্রহণই নয়, ধান লেভি দেওয়ার বিষয়ও বর্ণিত হয়েছে মুর্শিদাবাদের একটি হাবুগানে—

আইন এল ধান ধরা ভেবে হোল সব সারা
বড় বড় জোতদাররা হোল আধমরা
হিচাক্ দোম হিচাক্ দোম

যার ধান নাই সে গেদা গোম
ধান ধরতে বাবুরা এল জল খেতে দোব ওল তোল !

শ্চিমবঙ্গের প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠনের প্রতিক্রিয়ার পরিচয় পাওয়া যায় সমসাময়িককালে রচিত একাধিক লোক-সংগীতে। বিশেষত গম্ভীরা গানে। গম্ভীরা গানেই রাজনৈতিক বিষয়ের উল্লেখযোগ্য প্রাচুর্য—

তোদের দলতন্ত্রই হল সার
দেশবাসী শুধু করলে হাহাকার
অষ্টমাসে অষ্টরম্ভা যুক্তফ্রণ্টের উপহার।

অপর একটি গম্ভীরা গানে যুক্তফ্রণ্টের অন্তর্গত বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী শরিক দলগুলি পরস্পর পরস্পারের সঙ্গে যে বিবাদে লিপ্ত হয়ে দেশবাসীর আস্থা হারিয়েছিল সেই প্রতিক্রিয়াটুকু উপস্থাপিত হয়েছে—

দলে দলে করিস বিবাদ—গদী রাখবার তরে
এই গদীর মোহ ছেড়ে মোদের দেখবি কি প্রকারে।
দুর্নীতিমুক্ত করবি শাসন দূর হবে প্রবলের শোষণ
এই আশাতেই দেশবাসী তাড়িয়েছিল সব কংগ্রেসী
আজ আটমাস পরে সত্য করে বলতো কি বা ফলিল ফল
খাদ্য সমস্যা দিনে দিনে প্রবল।

পশ্চিমবঙ্গে একসময়ের যুক্তফ্রণ্ট সরকার ভেঙ্গে পি. ডি. এফ গভর্ণমেণ্ট গঠিত হয়েছিল এবং এই ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল পশ্চিমবঙ্গের এক সময়ের রাষ্ট্রমন্ত্রী আশুতোষ ঘোষ এবং ডঃ প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষের। শেষ পর্যন্ত পি. ডি. এফ. গভর্ণমেণ্ট অবশ্য স্থায়িত্ব লাভ করেনি, রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তিত হয়েছিল। মুর্শিদাবাদের একটি পাঁচালী গানে এই সব বিষয়কেই প্রকাশ করা হয়েছে।

সামনে আসছে ইলেকসন শুনে খারাপ হল ব্রেন
দেহের ভিতর চলছে যেন সাড়ে বারটার ট্রেন
আশু ঘোষ দেখি একেবারে দিলে শেষ করে
কাঁচা কাঁঠাল কিলিয়ে দিলে ভুঁতি বার করে

যুক্তফ্রণ্ট বলে, আমাদের সুখ নাই কপালে
কষ্ট করে একা পুঁতলাম দোন বাইব বোলে
প্রফুল্ল দাদা লড়িয়ে দিলেও আমাদের গুণের ভাই।

ভারতবর্ষের রাজনীতিতে অসংখ্য রাজনৈতিক দলের প্রভাব—প্রতিপত্তি। সব দলেরই মুখ্য লক্ষ্য এদেশে আদর্শ শাসন ব্যবস্থা কায়েম করা, জনগণের সকল প্রকার সমস্যার সমাধান করা। মাদ্রাজ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, পরবর্তীকালে অবিভক্ত কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট কামরাজ ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য নাম। একটি গানে বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী রাজনৈতিক দল এবং সেই দলগুলির রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের কথা বর্ণিত হয়েছে, বর্ণিত হয়েছে কামরাজের প্রসঙ্গও—

গণতন্ত্রী, ধনতন্ত্রী, দলতন্ত্রী
গান্ধীবাদী, সাম্যবাদী, সুবিধাবাদী শত শত
কংগ্রেস, কম্যুনিষ্ট, স্বতন্ত্রদলে
দেশসেবার কম্‌পিটিশন চলে,
সবাই আনবে দেশে রামরাজ
অতিশয় ব্যস্ত তাই কামরাজ।

ইদানীংকালের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা হ'ল মানুষের রকেটের সাহায্যে চন্দ্রাভিযান। মুর্শিদাবাদের একটি সঙের গানে সেই চন্দ্রাভিযান সম্পর্কে বলা হয়েছে—

চন্দ্রলোকে যাচ্ছি আমি ভাই
ভব ছেড়ে যাচ্ছি আমি নিয়ে শেষ বিদায়॥
যাব আমি রকেটে চড়ে শূন্যটিকে দেখব ঘুরে
অষ্ট গ্রহ দেখব সবে আছে কে কোথায়,
ভারতে লোক হল বেশী জায়গা থাকে তো দেখে আসি
কতকগুলো ছাঁটাই করে পাঠাব সেথায়।

আধুনিককালে বিজ্ঞানের অকল্পনীয় অগ্রগতির ফলে আমরা নানা ক্ষেত্রেই অভাবনীয় সুবিধা ভোগের সুযোগ পাচ্ছি। এমনই একটি সুবিধা হল

কৃত্রিম প্রজনন ব্যবস্থা গবাদি পশুর ক্ষেত্রে। একটি সঙের গানে এই বিষয়টিও স্থান পেয়েছে—

বলে ও দিদি কাজ হচ্ছে কলে কৌশলে
ঐ যে ইঞ্জেকসনে বাছুর হচ্ছে বিয়ে দাও তুলে ॥

অল্প কিছুদিন আগে 'শোলে' নামে খ্যাত একটি জনপ্রিয় হিন্দী ফিল্ম এসেছিল এবং দীর্ঘকাল ধরে এখানকার প্রেক্ষাগৃহে চলেছিল। একটি টুসু গানে এ হেন 'শোলে' ছবিটি সম্পর্কে গ্রামবাংলার মানুষের বিশেষত স্ত্রীলোকদের প্রতিক্রিয়াটি ধরা পড়েছে :

'রূপকথা'তে এসেছে 'শোলে' দেখতে যাবো দল মেলে।
ও মেজদি ও সেজদি যাবে গো 'শোলে' দেখতে ?
কি বা নিয়া কি বা ছেলা যাচ্ছে 'শোলে' দেখতে।
'শোলে' বইটা কি যে ভালো, কি যে ভালো লেগেছে।

এই ভাবে সমসাময়িক নানা ঘটনা অবলম্বনে রচিত অসংখ্য সংগীতের উল্লেখ করতে পারা যায়। মোটের ওপর লোক-সাহিত্য যে যুগের চলমানতার সঙ্গে তাল রেখে চলে, এই সত্যটিই প্রমাণিত হয় এর থেকে নিঃসন্দেহে।

বাংলা লোক-সংগীতে 'কলকাতা'

কলকাতা ভারতবর্ষের ভূতপূর্ব রাজধানী এবং বর্ত্তমানে পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী। কলকাতা বাংলাদেশের সংস্কৃতি চর্চার পীঠস্থান। তাছাড়া কলকারখানা কিংবা ব্যবসা-বাণিজ্যেরও কেন্দ্র ভূমি এই কলকাতা। কলকাতা কখনও মিছিল নগরী, কখনও আবার তা দুঃস্বপ্নের নগরী। কিন্তু এসবই তথাকথিত শিক্ষিত এবং শহরের মানুষের দৃষ্টিতে প্রতিফলিত কলকাতার রূপ। শত ত্রুটি এবং কলঙ্ক রটনা সত্ত্বেও গ্রাম বাংলার মানুষের কাছে এখনও কলকাতার এক অমোঘ আকর্ষণ। অনেকটা সেই রূপকথার রাজ্যের প্রতি শিশুমনের দুর্বার আকর্ষণের মত। কলকাতা গ্রামবাংলার মানুষের কাছে এক স্বপ্নের জগৎ, অনন্ত বিস্ময়ের লীলা নিকেতন। এখানকার অজস্র যানবাহন, প্রাসাদোপম অট্টালিকা প্রশস্ত রাজপথ, চিড়িয়াখানা-যাদুঘরের মত আকর্ষণীয় দ্রষ্টব্যস্থান সমূহের সমাবেশ—সব মিলিয়ে কলকাতা গ্রামের মানুষের কাছে এক বহু অভিলষিত দর্শন স্থান। গ্রামে বসে সেখানকার মানুষ কলকাতা সম্পর্কে কত কিই না শোনে। কেউ হয়ত কোন সূত্রে কলকাতায় এসে উপস্থিত হয় তারপর গ্রামে ফিরে গিয়ে তার অভিজ্ঞতার কথা সবিস্তারে বর্ণনা করে। গ্রামের সহজ সরল মানুষগুলি কল্পনায় কলকাতার রূপ প্রত্যক্ষ করে। বাস্তব জীবনে এ হেন কলকাতা দর্শনের সুযোগ অধিকাংশেরই ঘটেনা, তাই সেই অবরুদ্ধ বাসনা অভিব্যক্ত হয় এদের রচিত সংগীতে।

সাম্প্রতিককালে ব্যবসা বাণিজ্য, চাকরী বাকরী কিংবা রাজনৈতিকসূত্রে গ্রামবাংলার সঙ্গে কলকাতার যোগ অনেক নিবিড় হয়েছে, কিন্তু সেই নিবিড় পরিচয়ের প্রতিফলন তেমন করে ঘটেনি বাংলার লোক-সংগীতে। তাই অনুমান করা অযৌক্তিক হবেনা যে বর্তমান নিবন্ধে উদ্ধৃত গানগুলি অনেক পূর্ববর্তীকালের রচনা।

আমরা জানি কলকাতার খ্যাতির অন্যতম কারণ পুণ্যতীর্থ কালীঘাট, বাহান্নপীঠের অন্যতম একটি পীঠস্থান। সমগ্র বাংলাদেশেত বটেই, এমন কি সমগ্র ভারতবর্ষেও এই তীর্থস্থানটি সুপরিচিত। এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ হিন্দুধর্মাবলম্বী কিন্তু তবু বাংলার লোক-সংগীতে কলকাতা নানাকারণে বারংবার উল্লিখিত হলেও এই গুরুত্বপূর্ণ তীর্থস্থানটির কারণে একবারও উল্লিখিত হয়নি এটা বিশেষভাবে লক্ষ্য করার। বিশেষত অধিকাংশ লোক-সংগীত ই যেখানে ধর্মভিত্তিক। কলকাতা সংস্কৃতি চর্চার পীঠস্থান, সেইসঙ্গে এখানে অর্থোপার্জ্জনেরও নানা সুযোগ—সুবিধা। গ্রামবাংলার মানুষের কাছে কলকাতার আকর্ষণ তাই নিছক দ্রষ্টব্য স্থানসমূহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; শিল্পকলা চর্চার উপযুক্ত স্বীকৃতিলাভের সুযোগ এবং তদপেক্ষা প্রয়োজনীয় অর্থ-উপার্জনের অনুকূল সম্ভাবনাও এখানকার মানুষকে কলকাতার প্রতি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করেছে। পুরুলিয়ার একটি 'শোলোক গানে' সেই ব্যঞ্জনাটি উপস্থিত—

> চাবি গো চাবি, কলকাতায় নাচতে যাবি,
> একশ টাকা বেতন পাবি।

বাংলার লোক-সংগীত গুলিতে অনেক ক্ষেত্রেই যেমন অনবদ্য কবিত্ব শক্তির সার্থক রূপায়ণ লক্ষ্য করা যায়, তেমনি আবার লক্ষ্য করা যায় কল্পনা শক্তির দৈন্যদশা, বাণীরূপের অসংলগ্নতা অথবা অর্থহীন ভাবের সংযোজন। বস্তুতপক্ষে সংহত সমাজ জীবনের সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা ইত্যাদি অনুভূতিগুলির স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তিরই ফলশ্রুতি হল আমাদের লোক-সংগীতগুলি। শিশু যেমন যৎসামান্য উপকরণ নিয়েই আনন্দময় ক্রীড়ায় মত্ত থাকে, আমাদের দেশের সংহত সমাজের মানুষেরাও তেমনি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উপলক্ষ্যে

আনন্দোৎসবে নিমগ্ন হবার অন্যতম প্রধান উপকরণ স্বরূপ সংগীতের ওপর নির্ভর করে। তাই স্বভাবতঃই এক্ষেত্রে বাণীরূপের মূল্য অপেক্ষা সুরের মায়াজাল রচনা এবং সেই সুরমূর্চ্ছনায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত হওয়াই মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে ওঠে। মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত 'বেলপাহাড়ী' গ্রামের একটি 'লাগাড়ে' গানে উল্লিখিত হয়েছে কলকাতায় বাজারে এক সুসজ্জিতা রমণীর মৃত্যু কবলিত হওয়া। কিন্তু উদ্ধৃত সংগীতে সেই রমণীর মৃতদেহ স্থানান্তরিত করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা উচ্চারিত হয়েছে—

কলকাতার বাজারে বিটি মরিল.
কেউ না ফেলিতে মানা.
হাতে আছে চুড়বালা. কানে আছে কানপাশা.
ওনাকে হাতাও গে—
এন রাহ হুগিডি কায়পে

'লাগাড়ে গান' সাঁওতাল উপজাতিদের মধ্যে প্রচলিত। নৃত্য সহযোগে এই গান গীত হয়। বাংলা এবং সাঁওতাল উভয় ভাষাতেই এই গান রচিত হতে দেখা যায়।

কলকাতা মহানগরীর সর্বাধিক উল্লেখ ঘটেছে যেমন 'তুষু' গানে, তেমনটি কিন্তু লোক-সংগীতের অন্যান্য বিভাগে ঘটেনি। এমনকি 'তুষু' গানেরই অনুরূপ যে 'ভাদুগান', তাতে কিন্তু কলকাতার তেমন উল্লেখ ঘটেনি। বাঁকুড়ার একটি 'ভাদুগানে' যুদ্ধের বিভীষিকা বর্ণনা প্রসঙ্গে বাঁকুড়া এবং আসানসোলের মত শহরের সঙ্গে কলকাতার নামও উচ্চারিত হয়েছে—

ভাদু, হলো কি দেশে, সোলজাররা দেশ চাপ্যেছে
ঘরের মানুষ উঠাই দিয়ে সোলজাররা ঘরে বসে।
এরুপালেন, বোমা, কামান, ছাড়িয়ে থনে থনে,
সাঁতারবাবু ভেয়েরা উঠে গো জনে জনে।
বাঁকুড়া কোলকাতা আবার গো আসানসোল বন্ধ হছে,
বাঁকুড়ার খেতু গরাইগো, মটর বন্ধ করেছে।

ছড়ায় যেমন বহুল শব্দ নিছক ছন্দের প্রয়োজনে কিংবা শ্রুতিমাধুর্যের জন্যে

অথবা নিছক চমৎকারিত্ব সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হয়, লোক-সংগীতের ক্ষেত্রেও সর্বত্র না হলেও অনেক ক্ষেত্রেই বেশ কিছু বিষয় স্থান পেয়েছে যেগুলির আক্ষরিক মূল্যের সন্ধান করলে সচেতন শ্রোতা কিংবা পাঠককে ব্যর্থ হতে হয়, বিশেষত এইসব বক্তব্যের পারম্পর্যের সন্ধান লাভ দুরূহ হয়ে ওঠে। একটি 'পাতা নাচের গানে' মুখ্যতঃ এক সৌভাগ্যবতী রমণীর বিষয় উল্লেখ প্রসঙ্গে 'কলকাতা'র নামটি উল্লিখিত হয়েছে—

দালান গোড়ায় দূর্বাঘাস,
কোলকাতাতে বারোমাস,
হায়রে সাধের, ময়না,
এমন চাকরা—ভাতার হয় না ;
সকল কাজে ফাঁকি দিয়ে দিবেক শুধু গয়না ॥

এখানে কলকাতার অন্যতম বৈশিষ্ট্যের কথা বলতে গিয়ে বলা হয়েছে এখানকার দালান গোড়ায় বারোমাস দূর্বাঘাস দৃশ্যমান। কিন্তু বস্তুত এই বক্তব্যের যাথার্থ যে স্বীকার করে নেওয়া যায় না, কলকাতা বাসীর অভিজ্ঞতাই তার প্রমাণ। তবে হ্যাঁ, এই গানই যখন তার নির্দিষ্ট সুর সহযোগে গীত হয়ে থাকে, তখন সেই অনবদ্য সুর মূর্চ্ছনায় বক্তব্যের অসংগতি আর ধরা পড়ে না। একটি 'আলকাপ গানে'ও কলকাতা নগরীর কথা উল্লিখিত হয়েছে।

মা, মা, তোর জামায়ের বাড়ী আমি তো যাব না ;
তোর জামায়ের বাড়ীর ঠেলা দূরের ঘাটে জল আনা।
শাশুড়ী ননদ বসে থাকে এক কুলো ধান কেউ ঝাড়েনা,
তোমার জামাই কোলকাতাতে চাকুরী করে
বছর অন্তর একদিন ফিরে,
সারা রাত্রি কাগজ মারে, ডাকলে কথা কয়না ॥

বিবাহিতা এক রমণী তার মায়ের কাছে বলছে যে সে আর শ্বশুরবাড়ী যাবেনা। তার শ্বশুরালয় ত্যাগের কারণ দ্বিবিধ—প্রথমত বাড়ীর সব কাজই তাকে করতে হয়। গৃহস্থালীর কাজে শ্বশুরবাড়ীর কারোর সাহায্য সে পায়

না। বহুদূর থেকে জল আনা, ধান-ঝাড়া সব একাকী তাকেই করতে হয়। শাশুড়ী কিংবা ননদ বসে থাকে তবু এক কুলো ধান ঝেড়ে উপকার করেনা। তবে বিবাহিতা কন্যাটি তার বহু অভিলষিত স্বামীগৃহ ত্যাগের শেষ যে কারণটের কথা বলেছে সেইটিই আসল। তা হল স্বামীর সঙ্গলাভ থেকে বেচারী নিদারুণভাবে বঞ্চিত। বছর অন্তর একদিন করে স্বামী নিজের গৃহে উপস্থিত হয়। যদি বা দীর্ঘ ব্যবধানের পর গৃহে উপস্থিত হয়, তাও আবার সে নিজের কাজে ব্যস্ত থাকে, স্ত্রীর সঙ্গে তেমন বাক্যালাপ করেনা, এমন কি স্ত্রীর ডাকে সাড়া পর্যন্ত দেয় না। স্বামীসঙ্গ সুখ ভোগের সৌভাগ্য হলে কায়িক পরিশ্রমের ব্যাপারে কন্যার তেমন ওজুহাত থাকত না বোধকরি। কিন্তু যে স্বামীর মুখ চেয়ে তার অক্লান্ত পরিশ্রম, সেই স্বামীই যদি তাকে অবজ্ঞা করে, ঠিকমত সঙ্গদান না করে, তাহলে আর কি আকর্ষণে কন্যা স্বামীগৃহে পড়ে থাকে। গানটিতে বলা হয়েছে চাকরী উপলক্ষ্যে স্বামী কলকাতায় থাকে। গ্রাম বাংলায় বহুমানুষকেই যে স্ত্রী পুত্র পরিজন ছেড়ে চাকরী সূত্রে কলকাতায় থাকতে হয়, সেই সত্যের ইঙ্গিতটি গানটিতে রয়ে গেছে। তবে একটা কথা। যতই কেন কার্যোপলক্ষে স্বামীকে কলকাতায় অবস্থান করতে হোক, তবু বছর অন্তর তার একদিন মাত্র নিজগৃহে উপস্থিত হবার যৌক্তিকতা স্বীকার করা যায় না। অবশ্য গানটিতে বর্ণিত 'বছর অন্তর একদিন' এই বক্তব্যকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করা অপেক্ষা দীর্ঘ সময়ের ব্যবধান অর্থে ধরে নেওয়াই যুক্তিযুক্ত। বিরহ ব্যাকুলা পত্নীর কাছে দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে স্বামীর উপস্থিতি 'বছর অন্তর একদিন' বলে সম্ভবত প্রতিভাত হয়েছে।

বাংলা লোক-সংগীতের মধ্যে বেশ কিছু ঘটনামূলক সঙ্গীতের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। ঘটনামূলক সঙ্গীতগুলি সমসাময়িক রাজনৈতিক, সামাজিক, ঐতিহাসিক :অথবা পারিবারিক ঘটনা কিংবা চরিত্র অবলম্বনে রচিত। মুর্শিদাবাদের আম্রকানন পলাশীতে নবাব সিরাজদৌল্লার সঙ্গে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সৈন্যদের ঐতিহাসিক যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। মীরজাফর এবং অন্যান্যরা এই যুদ্ধে যেমন নবাবের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে নবাবের

ভরাডুবি ঘটিয়েছিল, তেমনি কিছু কিছু দেশপ্রেমিক বীর মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষাকল্পে অসীম সাহসিকতার সঙ্গে ব্রিটিশ সৈন্যদের মোকাবিলা করেছিলেন। এরকমই এক স্মরণীয় চরিত্র মীরমদন। কিন্তু পলাশীর যুদ্ধে মীরমদনকে মৃত্যু বরণ করতে হয়েছিল। মুর্শিদাবাদ জেলায় প্রচলিত একটি ঘটনামূলক সংগীতে মীরমদনের মৃত্যুর বিষয় বর্ণনা প্রসঙ্গে কলকাতায় মোহনলালের কন্যার ক্রন্দনের কথাও উল্লিখিত হয়েছে লক্ষ্য করা যায়—

কি হলোরে জান।
পলাশী ময়দানে নবাব হারাল পরাণ॥
তীর পড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে, গুলি পড়ে রয়ে,
একলা মীরমদন বল কত নেবে স'য়ে।
ছোট ছোট তেলেঙ্গাগুলি, লাল কুর্তি গায়,
হাঁটু গেড়ে মারছে তীর মীরমদনের পায়॥
কি হলোরে জান।
পলাশী ময়দানে নবাব হারাল পরাণ॥
নবাব কাঁদে, সিপুই কাঁদে, আর কাঁদে হাতী,
কলকাতায় বসে কাঁদে মোহনলালের বেটী॥
কি হলোরে জান।
পলাশী ময়দানে উড়ে কোম্পানী নিশান॥

ঢাকার অন্তর্গত ধল্লাগ্রাম নিবাসী লেহাজদ্দিন নামে জনৈক লোক-কবির একটি 'গোবীনামা জারী'তেও ক'লকাতা শহরটি উল্লিখিত হয়েছে। এই জারীতে বর্ণিত হয়েছে একটি গাভীর করুণ পরিণতির কাহিনী। উল্লেখযোগ্য যে মুসলমান কবি গাভীর মৃত্যুতে মাটির ক্রন্দনের কথা উল্লেখ করে প্রকারান্তরে মৃত গাভীটির প্রতি তাঁর নিজেরই অকৃত্রিম সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন। সে যাইহোক, গাভী হত্যার পর তার মাংস ভক্ষিত হয়েছে এবং তার চামড়া রৌদ্রে শুষ্ক করার পর সেই শুষ্ক চামড়া কলকাতায় চালান দেওয়ার কথা ব্যক্ত হয়েছে। অতঃপর কলকাতায় সেই চামড়া থেকে প্রস্তুত হয়েছে ভদ্রলোকের ব্যবহারের জন্যে জুতো এবং চামড়ার প্রস্তুত নানাবিধ

বাদ্য সামগ্রী যেমন ঢোলক, তবলা, খোল ইত্যাদি। উদ্ধৃত জারীটিতে কলকাতাকে চর্মশিল্পের কেন্দ্ররূপে বর্ণনা করা হয়েছে।—

গলে রশি দিয়া গাভীকে নিয়ে গেল হাটে,
অবশেষে বিক্রি দিল কসাই বেটার হাতে।
কসাই নিয়া গাভীকে গলে দিল ছুরি,
মাটি কেঁদে বলছে তখন, "আহা মরি মরি।"

গোস্ত খেয়ে তুষ্ট হয়ে চামড়াটা দেয় ফেলে,
অবশেষে ঋষি বেটা চামড়াটা দেয় মেলে।
রৌদ্রে শুকায়ে চামড়া করে টান,
অবশেষে পাঠায়ে দেয় কলকাতা চালান।
ঢোলক, তবল, সারিন্দা বাজায় কত খোল,
খুঞ্জুরি, দামামা, বাঁশী, দোতারা, তবল।
এই রকম কত জনে বাদ্যি বাজায়,
ভদ্রলোকে সুখ করেছে জুতা দিয়া পায়।

কলকাতা এক অত্যন্ত জনবহুল নগরী। শুধু জনবহুল নগরীই নয়, কলকাতা যেমন বিরাট অঞ্চল অধিকার করে আছে,তেমনি অসংখ্য এখানকার পথ-ঘাট। কত অফিস-আদালত, কাছারী আর সেইসব সূত্রে কত মানুষেরই না যাতায়াত এখানে। দোকান-বাজার, ব্যবসা-বাণিজ্য এসবের সংখ্যাও নেহাৎ কম নয়। বাস্তবিক কলকাতা বড় এক বিচিত্র নগরী। যে ব্যক্তি কলকাতা নগরীতে কখনও পদার্পণ করেনি, কলকাতার জীবন সম্পর্কে কোন ধারণা নেই, সেইরকম অনভিজ্ঞ মানুষের কাছে কলকাতা কি রকম গোলক-ধাঁধা রূপে আত্মপ্রকাশ করে, বিশেষত গ্রাম্য মানুষকে তা কতখানি দিশেহারা করে তোলে, পূর্ববাংলার তাঁতীদের একটি গানে সেই পরিচয়ই বিশেষ ভাবে পরিস্ফুট হয়েছে—

মরি হায়রে, আল্লা হায়,
আমি কি করিব কোথা যাব না দেখি উপায়।

কলিকাতা আইসা আমি ঠেক্‌লাম বিষম দায় ॥

পাঁচালী জাতীয় কয়েকটি গানেও কলকাতা নগরী বিভিন্ন উদ্দেশ্যে উল্লিখিত হয়েছে। কখনও ব্যক্তিগত কেচ্ছা প্রচারের জন্যে, কখনও বা নিছক স্থান হিসাবে, কখনও বা পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী হিসাবে কলকাতার নাম উচ্চারিত হয়েছে। টাকার মহিমাজ্ঞাপক একটি পাঁচালীতে টাকা বিনা আপনজনও কিরকম বৈগুণ্য প্রদর্শন করে তার বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি বলেছেন নিঃস্ব অবস্থায় তিনি নিঃসঙ্গ হয়ে কলকাতা, দিল্লী, বগুড়া, মুর্শিদাবাদ পর্যটনে রত। হয়ত এইসব শহরে যদি কিছু অর্থ উপার্জন হয় তারই চেষ্টায়—

টাকা নিয়ে ঘরে গেলে, কত রমণী সব যত্ন করে,
স্ত্রী পুত্র টাকা না দেখিলে তারা মুখ করে বাঁকা।
আত্মীয়তা কুটুম্বিতা কেবল টাকা।
কলিকাতা শহর দিল্লী শহর আর বগুড়া।
মুর্শিদাবাদ জেলা আমি ভ্রমণ করি একা ॥

বন্যাকবলিত পশ্চিমবঙ্গের অবর্ণনীয় বর্ণনা প্রসঙ্গে একটি লৌকিক পাঁচালীতে এমন কি পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী যে কলকাতা মহানগরী তারও শোচনীয় অবস্থার কথা উল্লিখিত হয়েছে—

কলিকাতার সে রাজধানী সেও তো নাইকো বাকী,
মোটর বাস সব অচল হলো, বলব আমরা কাকে।

এইবার কেচ্ছা বর্ণনা প্রসঙ্গে কলকাতাকে কি ভাবে উপস্থিত করা হয়েছে দেখা যাক—

এক মাগি কোলকাতাতে, বসে তার ছুতলাতে, পেয়েছে বেঁড়ে গত
তাইতে মাগি মরছে বকে, তা দেখে এক গোদা চিলে, রাঙাগায়ে
আঁচড় দিলে, আঘাতে পেটের ছেলে, উঠল হেলে গেল কেঁচে ॥
বিধবার গর্ভ হল, সধবা সাধ খাওয়ালো তা দেখে পাকাচুলো
মরে গেল মনের দুঃখে। কুমারীতে গর্ভবতী, তারাই হোল
মহামতী, মথুরার ঘরে তাঁতী কাল কাটিয়ে মহাদুখে ॥

একাধিক বাউল গানে কলকাতাকে মানবদেহের রূপক রূপে উপস্থিত

করা হয়েছে। একটি বাউল গানে কলকাতার লালদীঘি, বাগবাজার, সোনাগাছি, মানিকতলা, জোড়াসাঁকো ইত্যাদির উল্লেখ করে বলা হয়েছে—

ওরে মানব-দেহ কল্‌কাতা কেতা চমৎকার,
ও ভাই, লালদীঘির পানি বড় মিঠা যে শুনি,
কেও বা বলে লুনছা লাগে ঘর্মের হয় হানি।
ও পানি যে খেয়েছে সেই মজেছে সেই হ'য়েছে ভবপার—
কেতা চমৎকার ॥
তুমি কল্‌কাতার বাগবাজারে রও
ও, ভাই, কতই কাম বাজাও।
হরিনামের মুণ্ডা এনে ঠাণ্ডা হয়ে খাও!
যেদিন বাগবাজারে পড়বি ফেরে সেদিন প্রাণবাঁচান হবে ভার
কেতা চমৎকার ॥
কল্‌কাতার বায়ান্ন বাজার ও তার তেপান্ন গলি,
হাত ধরে ঘাড় মুচড়ে ভেঙ্গে দেয় নরবলি।
ও নামে সোনাগাছি মানিকতলা জোড়াসাঁকো আচ্ছা বাহার
কেতা চমৎকার ॥
তোমার গঙ্গার ধারে ঘর—কাঁপে থর থর—
তার ভিতর দেখতে পাবে আজব রং খেয়াল,
যাদুবিন্দু বোকা হয়ে ধুকা, উলোড় বনে দেয় সাঁতার,
কেতা চমৎকার ॥

আর একটি বাউল গানেও মূলতঃ দেহতত্ত্বের বিষয়কেই কলকাতার রূপকে উপস্থিত করা হয়েছে। এই গানটিতে উল্লিখিত হয়েছে কলকাতার বিখ্যাত ধর্মতলার মোড়, রাধাবাজার, পোস্তাবাজার, লাট সাহেবের বাড়ী, আলিপুরের জেলখানা, হিন্দু কলেজ (বর্তমান প্রেসিডেন্সী কলেজ), মনুমেণ্ট (শহীদ মিনার), মেটকাফ কলেজ, উল্টাডাঙ্গা ইত্যাদি।

আছে বাজার বহুতর, বাজার পোস্তা ভরপুর,
ললাটেতে লাটের বাড়ী জিহ্বায় জজের ঘর,

আছে কণ্ঠাতে কালেক্টর বসে কাছারী করে গুলজার ॥
আলিপুরের জেলখানা মনে বুঝে দেখ না,
দেহের মধ্যে চিন্তা গারদ নাই তার তুলনা,
পাবে মেটে কলেজ হিন্দু কলেজ
এই দেহের হলে বিচার ॥
দেহতত্ত্ব পরিচয় দেহ উল্টাডাঙ্গা হয়,
আজব কাণ্ড মনুমেণ্টে মূল পদার্থ রয়।
আছে চুলে চুলে চুল গণি:
গুণে কে করে সুমারে ॥

*　　　　*　　　　*

মানব-দেহ কলিকাতা, ভাই ক্রেতা চমৎকার।
তুলনা নাইক তার ॥
মনে বুঝে দেখ, ভাই, রতি তফাৎ নাই
আছে দুই গ্যাসের আলো দেখতে পাই।
ক'রে সোনার শহর দীপ্তকার ॥
লালবাজারে জোর দেখে চোখে লাগে ঘোর,
চিনে বাজার চিনলে পাবে ধর্মতলার মোড় ॥
আছে ভারী মজার রাধাবাজার
শেষে স্মরণ হয় সবার ॥

*　　　　*　　　　*

এই মানব দেহখান আছে কতরূপ বাগান,
কলিকাতা তার কোথায় লাগে ইংরাজের নির্মাণ,
আছে চৌদ্দ পোয়ার চৌদ্দ ভুবন,
খোদা খোদা করে তৈয়ার ॥

উদ্ধৃত গানটিতে শেষ পর্যন্ত বৈচিত্র্যের বিচারে ইংরাজ নির্মিত এই কলকাতা শহরের তুলনায় মানবদেহের শ্রেষ্ঠত্বকেই স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে।

এইবার 'তুষু' গানে কলকাতার সন্ধান নেওয়া যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বিভিন্ন প্রকার সংগীতের মধ্যে বিশেষ করে 'তুষু' গানেই কলকাতার উল্লেখ সর্বাধিক। সেদিক দিয়ে আমাদের বর্তমান আলোচনায় 'তুষু' গানগুলির ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। দ্বিতীয়ত, অধিকাংশ লোকসঙ্গীত যেখানে পুরুষের রচনা, সেক্ষেত্রে মুষ্টিমেয় যে ক'টি শ্রেণীর গান একান্তভাবে স্ত্রীলোকদের রচনা, 'তুষু' তার মধ্যে অন্যতম প্রধান। ফলে 'তুষু' গানে আমরা যে কলকাতাকে পাব, তা একান্তভাবে গ্রাম বাংলার স্ত্রীলোকদের দৃষ্টিতে প্রতিফলিত কলকাতার এক বিশেষ রূপ। আর সেই কারণে 'তুষু' গানে কলকাতা মুখ্যতঃ শাড়ী, গয়না, প্রসাধন সামগ্রী সংগ্রহের কেন্দ্রভূমি হিসাবে চিত্রিত হয়েছে। অবশ্য তাছাড়াও কোন কোন 'তুষু' গানে কলকাতাকে মিষ্টান্ন দ্রব্য প্রাপ্তির আদর্শ স্থান কিংবা উল্লেখযোগ্য দ্রষ্টব্য স্থানের জন্যে বিখ্যাত বলে চিত্রিত করা হয়েছে। প্রথমেই প্রসাধন দ্রব্য প্রসঙ্গে যে সব 'তুষু' গানে কলকাতা উল্লিখিত হয়েছে—

বাঁকুড়ার আয়না-চিরুণ কলকাতার ফিতা,
অতি যত্ন করে বেঁধেছি মাথা
তাও যে বাঁকা সিঁথা ॥

কিংবা, কলকাতা যে গেছলেন তুষু কি কি গয়না উঠেছে,
ইলির মিলির ঝিলির কাটা পায়ে পাতমিল আছে ॥

অন্য একটি 'তুষু' গানে কলকাতায় স্ত্রীলোকদের মাথার চুল এবং শাড়ী সম্পর্কে কৌতূহল প্রকাশিত হয়েছে—

কলকাতা যে গেছলেন তুষু কার কতটা চুল আছে ?
চুলের কথা বলব কি আর পিঠ ভেঙ্গে চুল পড়েছে।
কলকাতা যে গেছলেন তুষু কি কি শাড়ী উঠেছে ?
বেনারসী শাড়ী মাগো তার উপরে ছাপ আছে।

কলকাতা কেবল বিলাস-উপকরণের জন্যেই গ্রাম বাংলার মানুষের কাছে আকর্ষণীয় তা নয়, বৈচিত্র্যময় শৌখীন খাদ্য দ্রব্যের কারণেও কলকাতার এক অমোঘ আকর্ষণ তাদের কাছে—

কলকাতা যে গেছলে, তুষু, কি কি সন্দেশ উঠেছে,
এঁকা বেঁকা জিলপি খাজা নারকল তেলে ভাজেছে ।
আয় লো আয় সজনী,
বাস্কা ফুল বাস্কা ভরা দিব এখনি ।
পান বানালো পান, ও সখী, পানের ভিতর আধুলি,
আগাম জলে ফেলে ডুব কালাচাঁদের মাদুলী ॥

কিংবা, আচিরে পাচিরে পদ্ম, পদ্ম বই আর ফোটেনা ।
তুষুর হাতে জোড়া পদ্ম ভ্রমর বই বসে না ।
ভ্রমর এলো খাতা খাতা ও তুষু তুই ফুল পাতা ॥
এমন দেখে ফুল পাতাবি চলে যাবি কলকাতা ।
কলকাতা যে গেছলেন তুষু কি কি সন্দেশ উঠেছে ?
আঁকাবাঁকা জিলপী খাজা ফুলন তেলে ছেঁকেছে ।
সরু ঝাঝরা মিহিদানা এসেন্‌সেতে ছেঁকেছে ।

কলকাতার দ্রষ্টব্য স্থানগুলির মধ্যে অন্যতম হল চিড়িয়াখানা। এখানে রক্ষিত বিচিত্র সব জীবজন্তু ও পাখী গ্রামবাংলার মানুষকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। আবার বিচিত্র সব জীবজন্তুর মধ্যে বাঘের প্রতি আকর্ষণটাই একটু অধিক। একটি 'তুষু' গানে কলকাতার চিড়িয়াখানায় পিঞ্জরাবদ্ধ বাঘ দর্শনের কথা বলা হয়েছে—

ওপরে পাটা, নামো পাটা, তার ভিতরে দারগা
ও দারগা পথ ছেড়ে দাও, তুষু যাবে কলকাতা।
কলকাতা যে গেছলে তুষু কি কি দেখে এলে গো ?
তুষু বলে দেখে এলাম-সোনার খাঁচায় বাঘ বসে।

একাধিক 'তুষু'গানেই কলকাতার ছেলে-মেয়েদের প্রখর বিদ্রূপ-বাণে বিদ্ধ করা হয়েছে। গ্রামীণ মানুষেরা কলকাতার ছেলেমেয়েদের আচরণকে যে তেমন সুনজরে দেখেনি, তারই প্রমাণ নিহিত রয়েছে একটি গানে—

কোলকাতাতে দেখে এলাম ছোট ছোট ঝর কদম,
ছোঁড়ারা কুলকুলি দেয়, ছুঁড়িরা গাছের বাঁদর।

ওরে ওরে গোহা বাবলা তোরে করব রেইলগাড়ী
ওই গাড়ীতে চেপ্যে যাবো যতীনবাবুর ঘরবাড়ী।

গ্রামের মানুষ অনেকেই রেলগাড়ী দেখেনি। আবার গ্রাম থেকে কলকাতায় আসার একমাত্র না হোক অন্যতম উল্লেখযোগ্য মাধ্যম এই বহু অভিলষিত দর্শন রেলগাড়ী। অবশ্য যে সময়ে আলোচ্য 'তুষু' গানগুলি রচিত, তখন কলকাতার সঙ্গে গ্রামের যোগাযোগে এখনকার মত দূর পাল্লার বাসের ভূমিকা ছিল না বললেই চলে। একটি 'তুষু' গানে কলকাতা আসার আকর্ষণ হিসাবে রেলগাড়ীর কথা বর্ণিত হয়েছে—

তুষু যাবেক রেল দেখতে কলকেতা শহরে
আমায় ছাড়ে যেতে লারে—
উয়ার মন কেমন কেমন করে।

গ্রামের মানুষের কাছে কলকাতা যেন রূপকথার নগরী, অবস্থান তার সাত-সমুদ্র তের নদীর পারে। গ্রাম থেকে কলকাতার দূরত্ব—সে অনেক দূর। তাই একটি গানে চুলের বহর অনেকখানি বোঝাতে কলকাতার উপমা টেনে আনা হয়েছে অবলীলাক্রমে—

চল সারদা চল বরদা কুলিতে বাঁধ বাঁধাব,
কুলির জলে সিনান করব গরজে চুল শুকাব।
বেঞ্চিতলায় বেঁধেছি মাথা, চুলের মহক ছুটে কলকাতা।

শুধু কলকাতার ছেলেমেয়েদেরই নয়, টেরিকাটা বাবুদেরও একহাত নেওয়া হয়েছে একটি গানে—

এক পয়সা বিরি কলা কলকাতাতে ছড়াবো।
কলকাতার বাবুগুলার টেরি বাগা ছাড়াবো॥

গানে কলকাতার টেরিকাটা বাবুদের ওপর রাগের কথা ব্যক্ত হলেও রাগের কারণটি অবর্ণিত রয়ে গেছে। সম্ভবত কলকাতার কোন টেরিকাটা বাবু গ্রামের মানুষকে অবজ্ঞা করে কোন রূঢ় কথা বলে থাকবে বা রূঢ় আচরণ করে থাকবে। তারই প্রতিশোধ নেওয়া হয়েছে গানের মধ্য দিয়ে।

একটি 'চট্‌কা গানে' মূলতঃ কলকাতার শহুরে মেয়েদের চিত্র উপস্থিত করা হয়েছে লঘু পরিহাসের মধ্য দিয়ে—

আমার বাংলায় করে মোন ফাঁপর
চল যাই কইলকাতা শহর।
শহরে ভাড়া করলাম ঘর,
থাকি দোতালার উপর।
দিনে দিনে গিন্নীর মন করে ফর্ ফর্।
(আবার) গিন্নী গাড়ি ঘোড়া দৌড়িবার চায়
ও গিন্নী দ্যাখতে চায় দিল্লীর শহর—,
এসে এই কইলকাতা শহর॥
ও গিন্নী আলতা পরে পায়,
পায়ে ছ্যাণ্ডেল লাগায়,
চোখে চশমা, হাতে হাতঘড়ি যে দেয়,
ও গিন্নীর ভ্যানিটি ব্যাগ, সোনার গয়না গায়,
ও গিন্নী বাইনতে বলে লেকে ঘর
এসে এই কইলকাতা শহর।
ভেবে মুকুন্দ বলে মোনের আক্ষেপে
ও গিন্নীর গাছে সকলে,
স্বামীর কোলে দিয়ে ছেলে
রাস্তাতে চলে।
ও তার ড়ুরে শাড়ী, রেশমী চুড়ী, তবু আমায় ভাবে পর,
চল যাই কইলকাতা শহর॥

এইভাবে বাংলা লোক-সংগীতের বিস্তীর্ণ স্থান অধিকার করে আছে 'কলকাতা'। গ্রাম বাংলার মানুষের বিচিত্র কল্পনা এবং অভিজ্ঞতার কথা কলকাতাকে কেন্দ্র করে যে ভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে তেমনটি বাংলা দেশের অন্য কোন শহরকে কেন্দ্র করে প্রকাশিত হয়নি। সেদিক দিয়েও কলকাতা নগরীর গুরুত্ব একম্ এবং অদ্বিতীয়ম্।

বাংলা প্রবাদে কৃষি ও কৃষক

কৃষিপ্রধান আমাদের এই বাংলা দেশ। এখানকার জনসংখ্যার এক বিপুল অংশ কৃষির সঙ্গে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে যুক্ত। সামগ্রিকভাবে আমাদের দেশের অর্থনীতি হ'ল কৃষিভিত্তিক। অতএব এ হেন বাংলা দেশের প্রবাদে কৃষি ও কৃষক যে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান লাভ করবে, তা বলাই বাহুল্য। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা বাংলা প্রবাদে এ হেন কৃষি এবং কৃষককে কি ভাবে উপস্থিত করা হয়েছে তার পরিচয় নেওয়ার চেষ্টা করবো।

প্রসঙ্গত প্রথমেই বলে নেওয়া যেতে পারে যে বাংলা প্রবাদে কৃষি এবং কৃষককে সম্পূর্ণ দুই বিপরীত দৃষ্টিতে দেখা হয়েছে। প্রবাদে কৃষির গুরুত্বকে যথোচিতভাবে স্বীকার করে নেওয়া হলেও, যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে সোনার ফসল উৎপন্ন হয় সেই কৃষকদের কিন্তু মোটেই উজ্জ্বল ভাবমূর্ত্তি প্রতিফলিত হয়নি প্রবাদগুলিতে। বিপরীতক্রমে প্রবাদে যে কৃষককে আমরা পাই, সেই কৃষক হল হীন, চরম নির্বোধ, অকর্মণ্য এবং মূর্খ। আসলে যে কৃষক রোদে পুড়ে জলে ভিজে সমগ্র জাতির অন্ন সংস্থান করে দেয়, তার প্রতি এরূপ অকৃতজ্ঞ আচরণের মধ্যে এক সূক্ষ্ম মনস্তাত্বিক কারণ নিহিত রয়েছে।

কৃষককে চিরকালই সমাজ তার ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করে এসেছে। তাকে তার ন্যায্য প্রাপ্য আমাদের সমাজ কোনদিনই দেয়নি। অতএব যে কৃষককে দীর্ঘকাল ধরে শোষণ করে আসা হয়েছে তাদের প্রতি সেই শোষণকে অন্যায়ভাবে

অব্যাহত রাখার একটা অপচেষ্টার সন্ধান প্রবাদ গুলির মধ্য থেকে আমরা পাই। প্রবাদে একথা স্বীকার করা হয়েছে যে কৃষিকাজ খুব একটা সোজা ব্যাপার নয় এবং এ কাজে সকলে পারদর্শীও হয় না। অথচ এ হেন কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত যে চাষা একাধিক প্রবাদেই তার বুদ্ধির স্থূলতা সম্পর্কে কটাক্ষ করা হয়েছে। বলা হয়েছে—

চাষার বুদ্ধি বড় সরু।
আপনার গরুকে বলে—গুখেকোর বেটার গরু॥

অর্থাৎ ক্রোধের বশবর্তী হয়ে চাষা যখন নিজের গরুকে ভর্ৎসনা করে তখন প্রকারান্তরে সে শুধু নিজেকেই না, এমন কি নিজের পিতৃদেব সম্বন্ধেও অশালীন মন্তব্য করে বসে।

চাষার স্থূল বুদ্ধির পরিচয় জ্ঞাপক আর একটি প্রবাদে বলা হয়েছে—

যেমন চাষার বুদ্ধি বলে, পাড়াগাঁয়ের মাঠে।
নদী না দেখে নেংটা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে হাটে॥

স্পষ্টতঃই এখানে বোঝাতে চাওয়া হয়েছে যে, চাষা হাটের মাঝখানে উলঙ্গ অবস্থায় দণ্ডায়মান, কারণ সে স্নানের জন্য প্রস্তুত। অথচ কোথায় বা নদী আর কোথায় বা তার জল। সর্বসমক্ষে যে অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে, সেইভাবে দাঁড়িয়ে থাকাটা যে কতখানি অশালীন, তাও তার কাছে বোধের অগম্য। কিংবা লাজ-লজ্জা হীন যে চাষা তার কাছে এতাদৃশ আচরণ যে কোন একটা ব্যাপারই না, তারও ইঙ্গিত যেন প্রবাদটিতে পাওয়া যায়।

শালগ্রাম শিলা হলেন নারায়ণের প্রতীক। হিন্দুমাত্রের কাছেই তাই এ হেন শালগ্রাম শিলার বড়ই কদর। কিন্তু এ হেন শালগ্রাম শিলার মর্যাদা উপলব্ধি কিংবা মর্যাদা রক্ষা কোনটিই হয় না চাষার দ্বারা। তার কাছে অপর পাঁচটি প্রস্তর খণ্ডের মতন শালগ্রাম শিলাও একটি সাধারণ প্রস্তর খণ্ড মাত্র তার বেশি কিছু নয়। তাই ত বলা হয়েছে—

চাষার হাতে শালগ্রামের দশা বা মরণ।

স্থূল বুদ্ধি সম্পন্ন চাষার পরিহাস প্রিয়তার মধ্যেও তার বুদ্ধির স্থূলত্বই প্রকটরূপে আত্মপ্রকাশ করে বসে:

চাষার ঠাট্টা কাস্তের ঠোকর।

কিংবা, চাষার গদ্দি কাস্তের ঠোকর।

চাষা একমাত্র চাষের কাজেই দড়, অন্য জীবিকার ক্ষেত্রে কিন্তু তার চরম ব্যর্থতা। তাইত একটি প্রবাদে যেখানে বলা হয়েছে—

'চাষা জমি চষতে ভাল' সেখানে অন্য একটি প্রবাদে অভিব্যক্ত হয়েছে, চাষার অন্যবিধ কর্মে চরম ব্যর্থতার কথা :

চাষ করে খাচ্ছিল আবদুল, ছিল ভাল,
চৌকিদারি নিয়ে আবদুল পরাণে ম'ল।

এক্ষেত্রে, 'আবদুল' কোন ব্যক্তি বিশেষ নয় সমগ্র কৃষক সমাজেরই একজন প্রতিনিধি সে। কিংবা বলা চলে প্রতীক চরিত্ররূপে তাকে এখানে উপস্থিত করা হয়েছে।

চাষা যখন, তখন সে ভাল-মন্দ বিচার ক্ষমতা রহিত। অন্ততঃপক্ষে তার মধ্যে না আছে সূক্ষ্ম রসবোধ, না আছে উৎকৃষ্ট জিনিসের রসাস্বাদন করার ক্ষমতা। তা না হলে আর বলা হয়—

চাষা কি জানে মদের স্বাদ।

অন্য একটি প্রবাদেও প্রায়ই একইরূপ বক্তব্যের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়—

চাষা কি জানে কর্পূরের গুণ,
শুঁকে শুঁকে বলে সৈন্ধব নুন।

অতএব এ হেন নির্বোধ চাষার যদি অপরের কল্যাণ করার সৎ উদ্দেশ্যও থাকে, বাস্তব ক্ষেত্রে কিন্তু সেই উদ্দেশ্য তার মাধ্যমে আর ফলপ্রসূ হয় না, বরং বিপরীত ব্যাপার ঘটে যায়। তাই চাষার হিতকরী প্রয়াসেও খুব একটা আশান্বিত হবার কিছু নেই, বরং আশার থেকে সেক্ষেত্রে আশঙ্কার মাত্রাই অধিক হয়ে দেখা দেবার কথা। একটি প্রবাদে এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে :

চাষা যদি করে হিত,
করতে করতে বিপরীত।

এইবার চাষাকে কিরূপ অলস প্রকৃতির করে উপস্থিত করা হয়েছে তার পরিচয় নেওয়া যেতে পারে। অমাবস্যায় হাল চালনা করতে নেই, লোক-

সংস্কার অনুযায়ী অমাবস্যায় হালচালনা করলে বলদের বাত হয়। কৃষির কাজে চাষার মস্ত সম্বল বলদ। অতএব এ হেন বলদের বাতের আশঙ্কা থাকায় চাষা স্বভাবতঃই অমাবস্যার দিনগুলি চাষের কাজ থেকে বিরত থাকে। একটি প্রবাদে বলা হয়েছে যে চাষা অমাবস্যার জন্যেই ব্যাকুল ভাবে প্রতীক্ষা করে থাকে আর এই প্রতীক্ষার মূলে যত না বলদের জন্য তার ভাবনা, তার থেকে ঢের বেশি আগ্রহ তার নিজের অবকাশ লাভের প্রতি। প্রবাদটিতে বলা হয়েছে—

কুঁড়ে কৃষাণ অমাবস্যা খোঁজে।

প্রবাদে যে শুধু চাষার আলস্য কিংবা তার নির্বুদ্ধিতার প্রতিই বিশেষ ভাবে ইঙ্গিত করা হয়েছে তা নয়, একটি প্রবাদে তার রূপ নিয়েও চরম কটাক্ষ করা হয়েছে। বলা হয়েছে—

চাষার মুখ না আখার মুখ।

এখানে 'আখার মুখ' বলতে উনানের মুখকে বোঝান হয়েছে। অর্থাৎ চাষার মুখ মণ্ডল এতই শ্রীহীন যে তা অনেকাংশে উনানের মুখেরই সমান।

একটি প্রবাদে চাষার তুলনায় সামান্য একটি কাস্তের গুরুত্বকেই বড় করে দেখান হয়েছে। বলা হয়েছে—

চাষা মরে সেও ভাল তবু পরের কাস্তে না হারায়।

এক্ষেত্রে বক্তব্য অনেকটা এই রকম—চাষা মারা গেলে তেমন ক্ষতি নেই। যেহেতু চাষা তাই তার প্রাণের যেন কোন মূল্য নেই। কিংবা একজন চাষা মারা গেলে অনায়াসে অপর চাষা পাওয়া যাবে। কিন্তু কোন ক্রমে পরের কাস্তে হারান চলবে না। যেন একটি কাস্তে যদি হারিয়েও যায়, তো আর দ্বিতীয় কাস্তে আর সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয়ে উঠবেনা, এমনই জিনিসটি দুর্লভ এবং মহার্ঘ।

না, প্রবাদে শুধু চাষা কিংবা চাষার পিতাকে নয়, সেই সঙ্গে তার পুত্র-কন্যার প্রতিও কটাক্ষ করা হয়েছে। একটি প্রবাদে বলা হয়েছে চাষার ছেলে পাশা খেলতে বসে ক্রমাগত দশের কথা বলে। এর কারণ বুঝতে দেরী হয় না। যেহেতু চাষার ছেলে, তাই অন্যের দেখাদেখি পাশা খেলতে

বসলেও খেলার হিসাব তার আয়ত্তে নয়, তাই সব দানেরই মূল্য তার কাছে এক—

চাষার ছেলে পাশা খেলে নিত্য বলে দশ।

যে চাষার কন্যা জ্ঞান হওয়া অবধি বাবার দৌলতে চাষের কাজের সঙ্গে পরিচিত সেই কন্যাকেই দেখি বেগুন ক্ষেত দেখে বিস্মিত হতে। এক্ষেত্রে তার মূঢ়তার আধিক্য অপেক্ষা ন্যাকামিই যেন অধিকতর প্রকটিত—

নিত্য চাষার ঝি
বেগুন ক্ষেত দেখে বলে এ আবার কি।

চাষার মধ্যে ভারসাম্যেরও বড়ই অভাব, অন্ততঃ প্রবাদ সেই কথাই বলে। যদিও স্থিতধী মানুষের সংখ্যা নেহাৎই কম, সুখে দুঃখে ক'জন মানুষের পক্ষে সমান থাকা সম্ভব? তবু আক্রমণের বেলায় চাষাকেই উপলক্ষ্য করে নেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে এমনিতে সে পরিশ্রম করতে ইচ্ছুক নয়। নেহাৎ অভাবে বা প্রয়োজনে না পড়লে সে পরিশ্রমের পথে পা বাড়ায় না। আবার অবস্থা ভাল হলে তখন ধরাকে তার সরা জ্ঞান। প্রবাদের ভাষায়—

পড়লে চাষা গরু খায়, উঠলে চাষা বামুন খায়।

প্রবাদটির বাচ্যার্থ যাই হোক ব্যঙ্গার্থ হল,—অবস্থার বৈগুণ্য ঘটলে চাষা গরুকে খাটায়, বিপরীতক্রমে অবস্থার উন্নতি ঘটলে ব্রাহ্মণকেও মান্য করেনা।

পরিশ্রম না করেই চাষা কি রকম ফললাভের আনন্দে অকারণে বিভোর থাকে তার পরিচয় মেলে একটি প্রবাদে—

মনে মনে হাসে চাষা,
কাঁধে লাঙ্গল জাত ব্যবসা।

অর্থাৎ জাত-ব্যবসা তার কৃষিকর্ম হলেও, কাঁধে লাঙ্গলখানি ধরেই চাষার ভাবখানা যেন তার কর্তব্যকর্ম যথাযথভাবে সম্পাদন করা হ'ল।

প্রবাদে যে একতরফা ভাবে চাষাকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপের কশাঘাতে শুধু জর্জরিত করা হয়েছে তা নয়, কোন কোন প্রবাদে তার করুণ জীবনের কথা, অন্তহীন বঞ্চনার কথাও স্থান পেয়েছে, তবে তা নেহাৎই বিরল ব্যতিক্রম হিসাবে।

যে চাষা অক্লান্ত পরিশ্রম করে সোনার ফসল উৎপন্ন করে, নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসে, বিচিত্র এক সামাজিক তথা অর্থনৈতিক কারণে সেই হতভাগ্য চাষাকে প্রচণ্ড অন্নাভাবে, অপরিসীম দারিদ্র্যের মধ্যে কালাতিপাত করতে হয়। কারণ খুবই স্পষ্ট, তার পরিশ্রমের ফল সে নিজে সার্থকভাবে ভোগ করতে পারেনা। একটি প্রবাদে বলা হয়েছে—

হালিয়া হাল চষে কৃষাণ বোনে ধান।
আগে খায় চোরচোট্টা পিছে খায় কৃষাণ ॥

এখানে 'চোরচোট্টা' বলতে নিছক যারা মাঠের ফসল সকলের সঙ্গোপনে চুরি করে নিয়ে যায় তাদের বোঝান হয়নি, বোঝান হয়েছে ভদ্রবেশী চোরদের অর্থাৎ সেইসব সুদখোর মহাজনদের যারা দুঃস্থ চাষাকে চড়া সুদে দাদন দিয়ে তার ইহকাল—পরকাল দুইয়েরই সর্বনাশ ঘটায়।

চাষা আজীবন দুঃখ ভোগের শিকার। বেচারীরা সুখ কি তা জানেনা আর এই দুঃখ ভোগের কারণ কি তাও সম্ভবত তাদের অজানা। বংশানুক্রমিক ভাবে তাদের অন্যের শোষণের শিকার হয়েই জীবনটাকে শেষ করতে হয়। একটি প্রবাদে পরিহাসের মধ্য দিয়ে সেই নির্মম সত্যটিকেই প্রকাশ করা হয়েছে—

চাষার শুধু এগারো মাস দুঃখ আর সকল মাস সুখ।

অথচ দেশের সমৃদ্ধির ধারক ও বাহক হল এই অবহেলিত কৃষক সম্প্রদায়। অসংখ্য প্রবাদে যদিও চাষাদের সম্পর্কে যারপর নাই ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ অথবা পরিহাস করা হয়েছে কিন্তু অন্ততঃ একটি প্রবাদে চিরন্তন সত্যটিকে স্বীকার করে বুঝিবা চাষাদের নিদারুণভাবে আক্রমণ করার প্রায়শ্চিত্ত করা হয়েছে। তাই সমগ্র দেশের সমৃদ্ধির মূলে চাষাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা স্বীকার করে নিয়ে বলা হয়েছে—

চাষার বলেই দেশটা নাচে, সোনা ফলে গাছে।

চাষাকে নিয়ে আরও অনেক প্রবাদই রচিত হয়েছে। কোনটিতে প্রকাশিত হয়েছে চাষার আশার কথা, কোনটিতে বা স্থান পেয়েছে চাষার পরিচয়ের যে

মূল কিংবা বলা চলে তার অস্তিত্ব রক্ষার একমাত্র উপাদান যে ক্ষেত তার

যেমন—ক. আশায় মরে চাষা।

খ. যদি উয়াঁল কচুর পাত,
পাতে রইল চাষার ভাত।

গ. ক্ষেত্রের দৌলতে চাষা নয়ত ফকির।

ঘ. আষাঢ় মাস, চাষার আশ।

এ পর্যন্ত গেল চাষার প্রসঙ্গ। এইবার প্রবাদে কৃষিকে কি ভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে তার পরিচয় গ্রহণ করা যেতে পারে। প্রবাদে যে কৃষিকে অতিশয় গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে সে কথা প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে। একটি প্রবাদে স্পষ্টতঃই স্বীকার করা হয়েছে—

কাজের মধ্যে চাষ, রোগের মধ্যে কাশ।

কৃষিজীবী যারা, তাদের প্রায় বারো মাস দুঃখ ভোগের কথা প্রবাদে উল্লিখিত হলেও,জীবিকা হিসাবে কৃষি যে অত্যন্ত লোভনীয় একাধিক প্রবাদেই সেকথা বলা হয়েছে। যেমন—

ক. ক্ষেতের চাষে দুঃখ নাশে।

খ. বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস, তার অর্ধেক চাষ।

গ. ক্ষেতের কোণা, বাণিজ্যের সোনা।

কৃষির জন্যে অন্যতম প্রয়োজনীয় উপাদান হ'ল জল। তাই জলসেচের সুবন্দোবস্ত করে তারপর যদি কৃষির কাজে নামা যায়, তাহলে শ্রম সার্থক হবার সর্মাধিক সম্ভাবনা থাকে। প্রবাদের ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয় :

সেচ দিয়ে করে চাষ, তার সব্জী বার মাস।

অবশ্য জলসেচের ব্যবস্থা, জমি কর্ষণ, উপযুক্ত সার দান, নিয়মিত তত্ত্বাবধান এসব করলেই যে ফসল উৎপন্ন হবেই এমন কথা জোর দিয়ে বলা যায়না। নানা নৈসর্গিক কারণ আছে, যা চাষার নিয়ন্ত্রণের অতীত। শেষ পর্যন্ত তাই কৃষির সাফল্য একটা অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যেই থেকে যায়। আর তাইতো চাষাকে শেষ পর্যন্ত দৈব নির্ভর হতে দেখা যায় ফসল লাভের ব্যাপারে—

কি করবে ভাল গরু, কি করবে কারে।
দেবতা না দিলে চাষা কি করতে পারে॥

চাষার জমিকে যদি সুরক্ষিত অবস্থায় না রাখা যায়, তাহলে ছাগল, গরুর মত প্রাণীরা প্রবেশ করে উৎপন্ন ফসলের অথবা সদ্য পোঁতা চারা গাছের অপরিমেয় ক্ষতিসাধন করতে পারে। আর সেই কারণেই উপদেশ দেওয়া হয়েছে—

চারিদিকে দিয়ে বেড়া, তবে ধর চাষের গোড়া।

নতুবা অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল বিনষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা। আদর্শ কৃষি ক্ষেত্রের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

বাস করবে গাঁয়ের মাঝে, চাষ করবে যার মা—বাপ আছে।

এখানে 'মা' অর্থে গ্রামধোয়া জল, আর 'বাপ' অর্থে পুকুর। অর্থাৎ সোজা কথায় জলসেচের উপযুক্ত ব্যবস্থা আছে এমন জায়গাতেই চাষ করা বিধেয়।

তাই বলে আবার জলসেচের সুযোগ আছে বলে নদীর কূলে চাষ করা খুব বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নয়। যেহেতু সেক্ষেত্রে এক চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকতে হয়—বন্যার ফলে যে কোন সময়ে শস্য হানির আশঙ্কা থাকে—

নদীর কূলে চাষ, হয় ত ভাল,
নয় ত মন্দ, নয়ত সর্বনাশ।

এই একই বক্তব্যের প্রতিফলন অন্য প্রবাদেও লক্ষ্য করা যায়

নদীর ধারে চাষ, বালির ওপর বাস।

বসত ভূমির সংলগ্ন কৃষিক্ষেত্রই হল সবদিক থেকে আদর্শ কৃষিক্ষেত্র কারণ সেক্ষেত্রে কৃষিক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রে উৎপন্ন ফসল-দৃষ্টির মধ্যেই থেকে যায়। তাছাড়া বসতভূমির সংলগ্ন হলে কৃষিক্ষেত্রে যাতায়াতে সময় এবং পরিশ্রম দুইই বাঁচে। তাই বলা হয়েছে,

আনহি বসত, আনহি চাষ,
বলে ডাক তার বিনাশ।

চাষের জন্যে জমিতে ভাল করে মই দেওয়া প্রয়োজন। কারণ মই দিলে জমির মাটি ঝুরো হয়ে যায় যা কৃষির ব্যাপারে একান্তভাবে প্রয়োজনীয়। তাই

একটি প্রবাদে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে,

ক্ষেত তুষ্ট মইয়ে, ভোজন তুষ্ট দইয়ে।

গাছের অতিরিক্ত বাড় ভাল নয়, কারণ তার ফলে শস্যের পরিমাণ সীমিত হয়ে যায়। পরিবারে অবস্থানকারী বৃদ্ধ যেমন সংসারের কাজে তেমন লাগেন না, বরং সংসারের গলগ্রহ বলে বিবেচিত হন, তেমনি গাছের অতিরিক্ত বৃদ্ধি ফসল লাভের সম্ভাবনাকে তিরোহিত করে দেয় বলে এই ধরণের গাছ চাষার কাছে গলগ্রহ হয়ে দেখা দেয়। একটি প্রবাদে এই বিষয়টিকে সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে—

ভুঁইয়ের বালাই হুড়ো গেরস্থের বালাই বুড়ো

জমি মাত্রই যে তা কর্ষণযোগ্য হবে এমন কোন কথা নেই। তাই আগে থেকে জমির পরিচয় নিয়ে তবেই সেই জমিতে চাষ করতে হয়। নতুবা অনুর্বর জমি হলে শত চেষ্টা শেষ পর্যন্ত বিফলে যায়। একটি প্রবাদে এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে :

জায়গা জেনে বসি জমি জেনে চষি।

প্রধান দুই জীবিকা হল বাণিজ্য এবং কৃষি। দুইয়ের মধ্যে বাণিজ্যে বিপদের সম্ভাবনা সমধিক। বিশেষত প্রাচীন কালে যখন সমুদ্র-বাণিজ্যের বিশেষ চল ছিল। সে তুলনায় কৃষি অপেক্ষাকৃত নিরাপদ জীবিকা। অন্ততঃ প্রাণহানির কোন আশঙ্কা নেই এই জীবিকার ক্ষেত্রে। তাই একটি প্রবাদে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে বাণিজ্যে অন্যের সন্তানকে নিযুক্ত করার কিন্তু চাষের ক্ষেত্রে নিজের সন্তানের উপর নির্ভর করতে হয়—

পর পোয় বাণিজ্য, আপন পোয় চাষ।

কৃষি বলতে জমিতে উৎপন্ন করা যায় এমন অসংখ্য ফসলকে বোঝালেও প্রবাদে কৃষি বলতে মূলতঃ ধানকেই নির্দেশ করা হয়েছে। কারণ আমাদের দেশের প্রধান কৃষি দ্রব্য হল ধান। তাই ধানের রোয়া, ফলন ইত্যাদি বিষয়েই সর্বাধিক প্রবাদ রচিত হয়েছে। বলা হয়েছে—

ধানের আবাদে ধন।

অর্থাৎ ধান যদি ঠিকমত উৎপন্ন হয়, তাহলেই তার সুবাদে লাভ করা

যায় আকাঙ্ক্ষিত ধন। এমনকি সোনা-রূপার তুলনায় ধানকেই অধিক মূল্য দেওয়া হয়েছে—

ধান ধন বড় ধন আর ধন গাই।
সোনা রূপা কিছু কিছু আর সব ছাই॥

তবে হঁ্যা, ধানের চাষ করলেই যে বিত্তবান হওয়া যায় তা নয়, ঠিকমত তার ফলন হওয়া চাই বৈকি, নতুবা ধান চাষের ফলে পথের ভিখারী হওয়াও অসম্ভব ব্যাপার নয়।

ধানের তুল্য ধন নেই, যদি না পড়ে ভুসা।
ভায়ের তুল্য জন নেই, যদি না করে হিংসা॥

ধানের মধ্যে আছে আবার নানা প্রকারভেদ। প্রবাদে যে বিশেষ ধরণের ধানটিকে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করা হয়েছে, তা হ'ল কটকী ধান—

শাকের মধ্যে পুঁই, মাছের মধ্যে রুই।
ধানের মধ্যে কটকী, বউয়ের মধ্যে ছোটকী॥

ধান কখন বুনতে হয় এবং কখনই বা তা রুইতে হয়, তার পরামর্শও দেওয়া হয়েছে। আর এই পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করলে যে উপযুক্ত পুরস্কার লাভও ঘটে, তারও প্রলোভন দেওয়া হয়েছে—

বৈশাখী বোনা, আষাঢ়ী রোয়া,
জায়গা হয় না ধান থোয়া।

প্রথমে চাষ হয় আউসের, তারপর চাষ হয় আমনের। যখনকার যা, তখন সেটি করতে হয় বোঝাতে তাই বলা হয়েছে—

যখনকার যেমন, আউশ ফুরোলে আমন।

আউশ ধানের চাল কি রকম হয়, তার পরিচয়ও মেলে প্রবাদ থেকে—

আউশ ধানের চাল, আর ঠাকুরঝির গাল।

বর্ষাকালে উৎপন্ন আউশ ধানের চাল হয় মোটা। হঁ্যা, এই তথ্যটুকুও আমরা পাই প্রবাদ থেকেই—

ওদা ধানের চাল দড়, গোদা পায়ের লাথি বড়।

আউশ ধানের ফলন অত্যধিক হয় বৈশাখের প্রথম জলটি পেলে। তাই-ত বলা হয়েছে—

বৈশাখের প্রথম জলে, আউশ ধান দ্বিগুণ ফলে।

সত্য কথা বলতে কি জল ছাড়া ধান চাষ কদাপি সম্ভব নয়। তাই বর্ষাতেই হয় ধান চাষ। বর্ষার জল যত পায়, ধান তত শীঘ্র বেড়ে ওঠে। কিসে কি বাড়ে তার দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে তাই বলা হ'ল—

কথায় কথা বাড়ে, জলে বাড়ে ধান।
বাপের বাড়ি থাকলে মেয়ের বাড়ে অপমান॥

বর্ষাকালে যখন পুরোদমে চাষের কাজ শুরু হয়ে যায়, তখন নিজে না পারলে অপরকেও লাগাতে হয় চাষের কাজে। কারণ বর্ষা নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী। তাই বর্ষার নির্দিষ্ট সময়টুকুর সদ্ব্যবহার না করলে পরে পস্তাতে হয়—

আষাঢ়ে যে না খাটালে পর, মিছে তার ঘর দুয়ার।

ধান চাষের জন্যে বিশেষ জমির প্রয়োজন, যে কোন জমিতে যে কোন চাষ হয় না, বিশেষ করে ধান চাষ। তাই অনভিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে কৃষিতে সাফল্য লাভ করা খুবই দুরূহ—

জানেনা শোনে না বামন, চানার ক্ষেতে বুনে আমন।

ধান পাকার পর ধানের গুচ্ছ কেটে নেওয়া হয়, আর এই গুচ্ছ কাটার সঙ্গে সঙ্গেই ধান-জমি অন্য ফসল চাষের জন্যে প্রস্তুত হয়ে যায়—

গোছ কাটলে জমি খালাস।

অমানুষিক পরিশ্রম করে যে ধান উৎপন্ন করা হয়, দুঃখের বিষয় তার প্রকৃত পরিমাণ কিন্তু হয় অন্যান্য আবর্জনার তুলনায় খুবই কম। অর্থাৎ উৎপন্ন ফসলের উল্লেখযোগ্য অংশই অপ্রয়োজনীয় আবর্জনা অধিকার করে থাকে। প্রবাদে সে কথাও বলা হয়েছে—

ধান একগুণ, তুষ তিনগুণ।

আবার ধান যেটুকু পাওয়া যায়, তার তুলনায় আসল প্রয়োজনীয় যে চাল, তা লাভ করা যায় যৎসামান্যই। কি রকম?

ধান একমন, চালকে তেরজন।

কোথায় কোথায় প্রভূত ধান উৎপন্ন হয়, তার কথাও আমরা জানতে পারি প্রবাদ থেকে। যেমন একটি প্রবাদে এই প্রসঙ্গে বর্ধমানের উল্লেখ করা হয়েছে—

ধান আগুরি মুসলমান।
এই তিনে বর্ধমান।

শুধু বর্ধমান নয়, অন্যত্রও ধান ফলে, এবং তা বেশ উল্লেখযোগ্য পরিমাণেই। এমনই একটি স্থান হল অধুনা বাংলাদেশের অন্তর্গত বরিশাল—

ধান খুন খাল—তিন নিয়ে বরিশাল।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চাষা যে চাষ করে তা নিজের জমিতে নয়, পরের জমিতে। আর তাই তাকে গুনগার নেহাৎ কম দিতে হয় না। পরিশ্রমের তুলনায় তার প্রাপ্য হয় যৎসামান্য। তাও ঠিকে জমিতে চাষ করার ফলে তাকে সর্বদা এক অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে থাকতে হয় জমির মালিক যদি তাকে আর তাঁর জমিতে চাষ করার সুযোগ না দেন। এই অনিশ্চিত অবস্থাটি বোঝান হয়েছে একটি প্রবাদে এই বলে—

ঠিকের জমি, নিকের মাগ।

কৃষি ও কৃষক সংক্রান্ত অসংখ্য প্রবাদ রচিত হলেও কৃষকের মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার পরিচয়বাহী প্রবাদ কিন্তু তেমন রচিত হয় নি। মাত্র দু'টি একটি প্রবাদেই তাদের করুণ অভিজ্ঞতা বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে। যেমন একটি প্রবাদে বলা হয়েছে—

কি করবে কার্তিকের চাষে, ভাত পাইনা ভাদ্রমাসে।

একটি প্রবাদে এই সংসারে কারা বিশ্বাস্য নয়, সেই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে জমিদারকেও—

সাপ শালা জমিদার
তিন নয় আপনার।

বলাবাহুল্য প্রবাদটিতে জমিদারের অব্যবহিত পূর্বের পদটি জমিদারের বিশেষণ রূপে প্রযুক্ত হয় নি।

প্রবাদে চাষা সম্পর্কে যে তীব্র কটাক্ষ করা হয়েছে, তেমনটি কিন্তু

মহাজন, জমিদার, ভূস্বামী প্রভৃতিদের সম্পর্কে করা হয় নি। অথচ কৃষকের অত্যাচারিত এবং বঞ্চিত জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে অত্যাচারী এবং বঞ্চনাকারী মহাজন-ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ হওয়া ছিল স্বাভাবিক। এর ব্যতিক্রম এইটুকুই প্রমাণ করে যে প্রবাদ রচয়িতাদের সহানুভূতি কাদের পক্ষে ছিল।

পরিশেষে বলতে হয়, বাংলা প্রবাদ অনেক ক্ষেত্রেই রূপকাশ্রয়ী, কখনও কখনও আবার প্রবাদে বক্রোক্তিও দেখা যায়। কিন্তু কৃষিকার্য বিষয়ক প্রবাদগুলির ক্ষেত্রে বক্তব্য বিষয় অতিশয় স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষভাবে উপস্থাপিত। বলাবাহুল্য ব্যবহারিক মূল্যের গুরুত্বের কারণেই এসব ক্ষেত্রে রূপক বা বক্রোক্তি অনুপস্থিত।

বাংলা প্রবাদে লোক-বিশ্বাস ও লোক সংস্কার

মানসিক দিক দিয়ে সুস্থ মানুষ মাত্রেই চায় জীবনে সাফল্য, চায় নির্দিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হতে। তাই আমরা অনেকেই অভিলষিত সাফল্য লাভের জন্যে নানা ক্ষেত্রেই বেশ কিছু বিশ্বাস বা সংস্কারের অনুগত হয়ে পড়ি। বিশেষ একটি রঙের জামা পরে বেরোলে কার্যসিদ্ধি হয় বলে বিশ্বাস করি, আর তাই সম্ভবমত সকল গুরুত্বপূর্ণ কাজে বেরোবার আগে সেই বিশেষ জামাটি গায়ে চড়াই। কিংবা বাড়ী থেকে কোন শুভ কাজে যাত্রা করার আগে বিশেষ কারোর মুখ দেখে বেরোই অথবা বিশেষ কারোর মুখ যাতে দৃষ্টি পথে না পড়ে সে ব্যাপারে সাধ্যমত সতর্কতা অবলম্বন করি।

ইংরেজি 'Folk Belief' শব্দটির বাংলা করা হয়েছে লোক-বিশ্বাস। কিন্তু অনেকেই 'Superstition' শব্দটির প্রতিশব্দ রূপে যে 'সংস্কার' শব্দটিকে ব্যবহার করে থাকেন, তা যথেষ্ট নয়। কারণ সংস্কার মানেই যে তা মন্দ হবে এমন কোন কথা নেই। সংস্কার ভাল ও হতে পারে। কিন্তু 'Superstition' বলতে সংস্কারের মন্দ দিকটিকেই বিশেষভাবে বোঝায়। সে যাই হোক, এখন কথা হ'ল লোক-বিশ্বাস এবং লোক-সংস্কার বলতে কি বোঝায়? সাধারণ ভাবে মনে হতে পারে যে লোক-বিশ্বাস এবং লোক-সংস্কার দুইই এক। আভিধানিক অর্থের বিচারে যদিও দুইই এক—বিশ্বাস এবং সংস্কারের একই অর্থ আর—তা হল প্রত্যয় কিংবা বলা চলে গুণগত বিচারে উভয়ই এক হলেও পরিমাণগত ভাবে উভয়ের মধ্যে

কিছু পার্থক্য রয়ে গেছে। সংহত জনসমষ্টি যে বিশেষ বিশেষ আচার-আচরণকে কর্তব্য-অকর্তব্য বলে বিবেচনা করে, যেগুলির সঙ্গে তাদের শুভাশুভ বোধ জড়িত, তাই লোক-বিশ্বাস। লোক-বিশ্বাসের সঙ্গে ঐতিহ্যের সম্পর্ক খুবই কম, নেই বললেই চলে। কিন্তু লোক সংস্কার হ'ল সেই সব আচার-আচরণ যেগুলি পালনীয় কিংবা বর্জনীয় বলে বৃহৎ জনসমষ্টি শুধু বিশ্বাসই করেনা, ব্যবহারিক জীবনে তা মেনেও চলে। লোক-সংস্কার ঐতিহ্য নির্ভর। লোক-বিশ্বাস খুব সাম্প্রতিককালের হতে পারে, কিন্তু লোক-সংস্কারের মূল গভীরে প্রোথিত যা পুরুষানুক্রমে বিশ্বস্ত ভাবে অনুসৃত হয়ে থাকে।

লোক-বিশ্বাস অনুসৃত না হলেও তেমন কোন মানসিক প্রতিক্রিয়া দেখা যায় না সংহত সমাজের অন্তর্ভুক্ত সামাজিক মানুষের মনে। কিন্তু লোক-সংস্কার অনুসৃত না হলে প্রায় সব ক্ষেত্রেই একটা তীব্র মানসিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। বলা বাহুল্য, সে প্রতিক্রিয়া মানসিক ভয়সঞ্জাত। অবশ্য বিশ্বাস এবং সংস্কার দুইয়ের ক্ষেত্রেই তেমন কোন কার্য-কারণ সম্পর্কের সন্ধান পাওয়া যাবে না। উভয়ক্ষেত্রেই ভাবালুতা কাজ করে বেশি। বৈজ্ঞানিক বিচার-বিশ্লেষণ তথা দৃষ্টিভঙ্গী উভয় ক্ষেত্রেই প্রায় বলা চলে অনুপস্থিত। দুইয়ের ক্ষেত্রেই অন্ধ-বিশ্বাস এবং আনুগত্যের মনোভাবই ক্রিয়াশীল। লোক-বিশ্বাস বা সংস্কারের সঙ্গে আমাদের ঐহিক শুভাশুভের কোন সম্পর্ক থাকুক বা নাই থাকুক, তবু একথা ঠিক যে মনস্তাত্ত্বিক দিক দিয়ে এই বিশ্বাস বা সংস্কারের মূল্য খুব কম নয়। যেমন সংহত সমাজে যা নাকি শুভ বলে স্বীকৃত যা দেখে গৃহ থেকে যাত্রা করলে যাত্রার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় বলে বিশ্বাস, সেই বস্তু বা প্রাণীর দর্শনে মানুষ মনে অনেকখানি জোর পায়, যে জোর তাকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হতে অনেকখানি সাহায্য করে। আবার বিপরীত ক্রমে, যা অশুভ বলে গৃহীত, সেই বস্তুর বা প্রাণীর দর্শনে মানুষের মনে এক বিপরীত ক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। যার ফলে তার আত্মবিশ্বাস অনেকাংশে হারিয়ে যায়। এইবার বাংলা প্রবাদ অবলম্বনে আমরা কিছু লোক-বিশ্বাস এবং লোক-সংস্কারের পরিচয় গ্রহণ করব।

বয়স, তারিখ এমন কি কেনা-বেচার ক্ষেত্রেও 'তের' সংখ্যাটি ক্ষতিকারক বলে বিশ্বাস করা হয়—

তের (অ)
ফের (অ)।

একটি গ্রাম্য সংস্কারে সোম ও বুধবারে সঞ্চয়ে হাত দিতে নিষেধ করা হয়েছে। এমনকি এই দু'দিন খাবার জন্যেও ঋণ করতে নেই—

সোমে বুধে দিও না হাত
ধার করে খেয়োনা ভাত।

অপর একটি গ্রাম্য সংস্কারে সোমবার এবং শুক্রবার নতুন শাড়ী পরলে প্রচুর ধান লাভের কথা বলা হয়েছে—

সোমে শুক্রে পরে শাড়ী
ধান হয় তার আড়ি আড়ি।

গৃহ থেকে যাত্রাকালে কি কি দর্শনে শুভ এবং কি কি দর্শনে অশুভ, সেই সম্পর্কে বেশ কিছু প্রবাদ রচিত হয়েছে। যেমন যাত্রাকালে শঙ্খচিল দর্শন শুভ কিন্তু গোদাচিল ঠিক তার বিপরীত। অর্থাৎ অশুভসূচক—

শঙ্খচিলের ঘটিবাটি
গোদাচিলের মুখে লাথি।

রবি, বৃহস্পতি আর মঙ্গলবারে ঊষাকালের যাত্রা খুব শুভ—

রবি গুরু মঙ্গলের ঊষা,
আর সমস্ত ফাসাফুসা।

শুভযাত্রা প্রসঙ্গে আর একটি প্রবাদ—'মঙ্গলের ঊষা বুধে পা, যথা ইচ্ছা তথা যা।'

আবার অশুভ যাত্রার প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

ছাগলের কান নাড়া, গরুর কাশ,
বিড়ালের হাঁচি করে সর্বনাশ।

অতএব যাত্রাকালে ছাগলের কান নাড়া দেখা, গরুর কাশি কিংবা

বিড়ালের হাঁচি শোনার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন প্রয়োজন, নতুবা যাত্রার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবার সম্ভাবনা।

যাত্রা সম্পর্কে বিশ্বাস এবং সংস্কার অনেক। যেমন যাত্রা করে ডান দিকে যদি সাপ দেখা যায়, বামদিকে দেখা যায় শিয়াল কিংবা গয়লা গাভীকে দোহন করার উদ্দেশ্যে গমনরত, তাহলে শুভ হয়।

ডাইনে ফণী, বামে শিয়ালী
দহিলে দহিলে বলে গোয়ালী
তবে জানিবে যাত্রা শুভালি।

তিন ব্রাহ্মণ এবং এক শূদ্রের একসঙ্গে যাত্রা করা নিষেধ। যাত্রা করলে ফল অশুভ হয়—

তিন বামুন এক শূদ্দুর,
কোথা যাও নির্ব্বংশের পুত্তুর।

যাত্রাকালে অশুভ লক্ষণের কথা বলতে গিয়ে একটি প্রবাদে বলা হয়েছে—

শুকনো কাঠে রটে কাউ
ভাস্তি দাপুনি, দেখে লাউ।
যোগী আদ্য, ছুছু কলসী,
তা দেখিলে না ঘরে আসি॥

অর্থাৎ শুষ্ক কাষ্ঠে উপবিষ্ট কাক, দর্পন, আধখানা লাউ, শূন্য কলস—এসবই অশুভ। অশুভ লক্ষণের প্রসঙ্গে আরও বলা হয়েছে—

শূন্য কলসী, শুকনা না,
শুকনা ডালে ডাকে কা।
যদি দেখ মাকুন্দ ধোপা,
এক পা না বাড়াও বাপা॥
এ সকলে পায়ে ঠেলি,
যদি না সমুখে দেখি তেলী।

যাত্রা পথে শূন্য কলস, ডাঙ্গায় রাখা নৌকো, শুষ্ক ডালে উপবিষ্ট কাকের ডাক, শ্মশ্রুগুম্ফশূন্য ধোপা ইত্যাদি দেখা খুবই অশুভ।

অশ্লেষা মঘা নক্ষত্রে যাত্রা অশুভ বলে সংস্কার প্রচলিত। এতদ্‌সম্পর্কিত প্রবাদটি হল—

মঘা এড়াবি ক'ঘা।

শুভ যাত্রার নানা লক্ষণ। যেমন যাত্রাকালে ভরা কলসী অপেক্ষা শূন্য কলসী জল ভরতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে দেখাটা শুভ, মা যদি সন্তানকে পেছন থেকে ডাকেন তাহলে সেটাও একটা শুভ লক্ষণ, মৃত ব্যক্তি অপেক্ষা যে ব্যক্তিকে গঙ্গা যাত্রা করতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সেই রকম ব্যক্তিকে দেখা শুভ। শৃগাল যাত্রাপথের বামে থাকলে শুভ কিন্তু ডাইনে অশুভ অথবা ফিরে চাইলেও উত্তম। বাঁধা অপেক্ষা ছাড়া গরু এবং সে গরু যদি মাথা তুলে তাকায়—এমনটি দেখতে পাওয়া সৌভাগ্যের ইঙ্গিতবহ—

ভরা হতে শূন্য ভাল যদি ভরতে যায়।
আগে হতে পিছে ভাল যদি ডাকে মায়।
মরা হতে ভাল যদি মরতে যায়।
বাঁয়ে হতে ডাইনে ভাল যদি ফিরে চায়।
বাঁধা হতে খোলা ভাল যদি মাথা তুলে চায়।
হাসা হতে কাঁদা ভাল যদি কাঁদে বাঁয়।

আসলে আগেকার দিনে যখন পথ ছিল দুর্গম, যানবাহনের তেমন সুব্যবস্থা ছিলনা, তখন বাড়ী থেকে যাত্রা করে নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হওয়া ছিল এক অনিশ্চিত ব্যাপার। সেই জন্যেই, যাত্রাকে শুভ এবং সার্থক করার ব্যাপারে সে যুগের মানুষ যে খুব বেশি সচেষ্ট ছিল তারই প্রমাণ যাত্রা সম্পর্কিত প্রবাদের আধিক্য।

একটি প্রবাদে বলা হয়েছে কি ভাবে গৃহে লক্ষ্মীকে অচলা রাখা যায়—

সকালবেলায় ছড়া ঝাঁট
সন্ধ্যি কালে বাতি
লক্ষ্মী বলে সেইখানেতে
আমার বসতি॥

অষ্টমস্থানে আশ্রিত শনি জাতকের প্রাণহানি ঘটায় বলে বিশ্বাস। একটি প্রবাদে এই লোক-বিশ্বাসটি প্রতিফলিত হতে দেখা গেছে—

একে শনি তায় রন্ধ্রগত।

যে ব্যক্তির জন্মলগ্ন থেকে একাদশ স্থানে বৃহস্পতি, সেই ব্যক্তি প্রভূত সমৃদ্ধির অধিকারী হয় বলে বিশ্বাস। আর এই বিশ্বাস থেকেই সৃষ্টি হয়েছে 'একাদশে বৃহস্পতি' প্রবাদমূলক এই বাক্যাংশটি। অমাবস্যায় হাল চালন নিষেধ। তাই তো বলা হয়েছে—

কুঁড়ে কৃষাণ অমাবস্যা খোঁজে।

লোক-বিশ্বাস এই যে, কাউকে একসঙ্গে তিনটি জিনিস দিতে নেই, দিলে গ্রহণকারী ব্যক্তি শত্রুতে পরিণত হয়। একটি প্রবাদে তাই বলা হয়েছে—

তিন শত্রু দিতে নেই।

শয়নের ব্যাপারে বেশ কিছু সংস্কার প্রচলিত আছে, বিশেষত কোন দিকে মাথা রাখতে হবে সেই ব্যাপারে—

প্রবাসে উত্তর শির, দক্ষিণ
শির ঘরে।
শ্বশুরবাড়ী পূর্ব শির, শুয়োনা
পশ্চিম শিরে॥

স্ত্রীভাগ্যে ধনলাভ ঘটে, আর পুত্র সন্তান লাভের ব্যাপারে কার্যকরী হয় পুরুষের ভাগ্য—এই সংস্কার অনেকেই মানেন—

স্ত্রীভাগ্যে ধন, পুরুষভাগ্যে পুত্র।

দ্বিতীয় বিবাহের ফলে যদি পুত্র সন্তানের জন্ম হয়, তাহলে সংসারের পক্ষে তা খুবই অশুভ হয় বলে বিশ্বাস। বিপরীতক্রমে দ্বিতীয় বিবাহের ফলে কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করলে তা সংসারের পক্ষে খুবই শুভ হয়—

শেষ ঘরে হয় পুত, সংসারে
লাগে ভূত।
শেষ ঘরে হয় মেয়ে, ঘি পড়ে
শিকে বেয়ে॥

পুরুষ মানুষের ক্ষেত্রে বাঁ চোখ নাচা খুব খারাপ। তা ক্ষতির নির্দেশক। কিন্তু ডান চোখ নাচলে তা শুভের ইঙ্গিতবহ। অপরপক্ষে স্ত্রীলোকদের বাঁ চোখ নাচাটাই তাদের ক্ষেত্রে শুভ আর ডান চোখ নাচলে তা ক্ষতির ইঙ্গিত বহন করে আনে।

ডাইনে উচু বাঁয়ে উচু,
লাভ হয় কিছু কিছু।

বুধবারে নতুন কাপড় পরতে নেই। কারণ—'বুধে সাত পুতে নেংটা।' গ্রাম্য সংস্কারে কাঁজি কাউকে দিতে নেই। একটি প্রবাদে এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

কানজি চাইলে ঝাড়া মারিও
দুধ চাইলে হাঠ্যা দিও।

'কাঁজি' শব্দটি এসেছে 'কাঞ্জিক' শব্দটি থেকে। যার অর্থ হল আমানি বা সজল ভাত থেকে প্রস্তুত সিরকা।

মাছের কাঁটা গলায় আটকালে বেড়ালের পায়ে নমস্কার করতে হয়। বিশ্বাস এতে নাকি গলায় কাঁটা নেমে যায়। একটি প্রবাদে এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

ডাইল দা খাইতাম
বিলাইরে ঠেং দেখাইতাম।

অপর পক্ষে অন্য একটি প্রবাদে বলা হয়েছে—

মাছের কাঁটা গলায় দড়
বিড়ালের পায়ে গড় কর।

অর্থাৎ ডাল দিয়ে ভাত খেলে আর গলায় কাঁটা লাগার কোন সম্ভাবনা থাকেনা। সেক্ষেত্রে বেড়ালের মত প্রাণীর পায়ে ধরা তো দূরের কথা লাথি দেখানোও যেতে পারে। কিন্তু গলায় কাঁটা বিঁধলে তখন সেই বেড়ালেরই পায়ে ধরতে হয়। আসন, বাসন আর নিজের গা কখনও বাজাতে নেই, বাজালে নাকি লক্ষ্মী ছেড়ে যান, অন্ততঃ প্রবাদে এই বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটেছে—

আসন, বাসন, গা তিন বাজাবে না।
তিন বাজাবে যখন, লক্ষ্মী ছাড়বে তখন ॥

একটি প্রবাদে শুক্রবারে নখ কাটতে নিষেধ করা হয়েছে। বলা হয়েছে এইদিন নখ কাটলে নাকি সুখ চলে যায়। চুল, নখ ইত্যাদি দেহের মধ্যেকার বর্জ্য জিনিসগুলির সঙ্গে অশুভ শক্তির গভীর যোগ বহু প্রাচীনকাল থেকেই পৃথিবীর বহু দেশেই বিশ্বাস করা হয়ে এসেছে। সেই বিশ্বাসের প্রতিফলনই প্রবাদটিতে ঘটেছে—

শুক্রবারে কাটে নখ,
সেই সঙ্গে কাটে সুখ।

স্ত্রীলোকের কুলক্ষণ সংক্রান্ত অনেক বিশ্বাস এবং সংস্কার প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে একটি হ'ল এই যে, স্ত্রীলোকের পা খড়মের মতন, অর্থাৎ যার পায়ের তলদেশের মধ্যভাগ চলাকালে মাটি স্পর্শ করে না, শূন্যে থেকে যায় সেই স্ত্রীর স্বামী অকালে মৃত্যুবরণ করে। তাই পত্নী নির্বাচনের সময় এই বিশ্বাস বা সংস্কারের বশবর্তী হয়ে খড়মঠেঙী কন্যাকে বধূরূপে মনোনীত করা হয় না অনেকক্ষেত্রে প্রবাদে খড়মঠেঙীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে—

খড়মঠেঙী ভাতার খায়।

শুধু খড়মঠেঙী নয়, স্ত্রীলোকের কুলক্ষণ সম্পর্কে বলতে গিয়ে অন্য একটি প্রবাদে বলা হয়েছে—

উট্‌কপালী চিরুনদাঁতী, গোদা পায়ে মারবে লাথি।

সব মানুষই পুত্র এবং কন্যা দুইই চায়। শুধু পুত্র বা কন্যায় কারো আশ মেটে না। তার ওপর যদি কোন ব্যক্তির পর পর তিনটি কন্যা সন্তান প্রসব করে, তাহলে সেই ব্যক্তির মানসিক অবস্থা সহজেই আমরা অনুমান করতে পারি, বুঝতে পারি ব্যক্তিটি এর পর একটি পুত্র সন্তানের জন্যে কতটা ব্যাকুল। কিন্তু প্রবাদের বক্তব্য অনুযায়ী তিনটি কন্যার পর যদি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে, তবে তা অতিশয় কুলক্ষণ বলে বিবেচনা করতে হবে—

তিন ঝি হইয়া পুত,
ঘরে সামায় যমদূত।

অপরপক্ষে তিনটি পুত্র সন্তানের পর যদি কারো ভাগ্যে কন্যা লাভ ঘটে, সেক্ষেত্রে কিন্তু তা সৌভাগ্যের ব্যাপার বলেই বিবেচিত হয়ে থাকে—

তিন পুত হইয়া হয় ঝি,
কন্নই বাইয়া পড়ে ঘি।

অপরপক্ষে মঙ্গলবার শুরু হলে চলে তিন দিন সাত। কিন্তু সপ্তাহে অন্যান্য দিনে বৃষ্টি হলে একদিনেই তা শেষ হয়ে যায়। প্রবাদে এই সম্পর্কে বলা হয়েছে—

শনির সাত মঙ্গলের তিন
বাকি সব দিন দিন।

অনেক কিছু নির্দিষ্ট দিনে করতে নেই, করলে ক্ষতি হয়। যেমন শনিবার বীজবপন করতে নেই, আর ঘর তৈরী করতে নেই বুধবারে—

শোনে ক্ষেতি বুধে ঘর।
মানুষে কয় না করা।

যাত্রা এবং চাষ এই দুইয়ের মধ্যেই রয়েছে অনিশ্চয়তা তাই এই দুটি কাজ যাতে সার্থক হয় তার জন্যে কতই না প্রচেষ্টা। একটি প্রবাদে চাষ এবং যাত্রা করার জন্যে সোম এবং শুক্রকে আদর্শ বলে অভিহিত করা হয়েছে—

সোমে শুক্রে চাষ বাস
যথা ইচ্ছা তথা যাস।

খেতে বসে মেয়েদের কখনই খাওয়া অসম্পূর্ণ রেখে উঠতে নেই, উঠলে শ্বশুর বাড়ী হয় বহুদূরে। কি রকম?

আধখাওয়াতে ছাড়ালে পিঁড়ি
অনেকদূরে শ্বশুর বাড়ী।

স্নান করার পর আহার্য্য গ্রহণ করতে হয়। তার পরিবর্তে যদি কেউ আহার্য গ্রহণের পর স্নান করে, তাহলে তার ক্ষতি হয় প্রবাদের ভাষায়—

খেয়ে দেয়ে নায়, পরের ভাল চায়।

বিপদাপন্ন ব্যক্তি কখনই একটি বিপদের সম্মুখীন হয়েই বিপদ থেকে রেহাই পান না, পরপর অনেকগুলি বিপদের মুখে পড়তে হয়। তাঁকে তাই বলা হয়েছে—

একে ধরে যারে, দশে বেড়ে তারে।

এইভাবে বাংলা প্রবাদে আমাদের বিশ্বাস এবং সংস্কারের নানা পরিচয়ই বিধৃত হয়েছে। শুধু প্রবাদেই বা কেন, তাছাড়াও অসংখ্য বিশ্বাস এবং সংস্কার চলিত রয়েছে। এই সব বিশ্বাস এবং সংস্কারগুলি আমাদের সংগ্রহ করা প্রয়োজন নতুবা অদূর ভবিষ্যতে এসব হারিয়ে যাবার সম্ভাবনা।

বাংলা লোক-সাহিত্যে জীব-জন্তু

শুধুমাত্র ভাবের গভীরতা, স্বভাব-কবিত্ব এবং অনুপম রচনাশৈলীই নয়, সেই সঙ্গে বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যও বাংলার সুবিস্তৃত লোক-সাহিত্যকে রসিক পাঠক সমাজের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলেছে নিঃসন্দেহে। বাংলা লোক-সাহিত্যের এক উল্লেখযোগ্য অংশ অধিকার করে আছে নানাবিধ বন্যপ্রাণী, জন্তু ও জানোয়ার। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা সেই বিষয়েই সংক্ষিপ্ত পরিচয় লাভের চেষ্টা করব।

লোক-সাহিত্যের এক উল্লেখযোগ্য বিভাগ ধাঁধা। নরনারী, প্রকৃতি, প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহৃত নানাবিধ তৈজস পত্রাদি প্রভৃতি অবলম্বনে যেমন বিপুল সংখ্যক ধাঁধা বাংলায় রচিত হয়েছে, তেমনি নানাবিধ পশু-পক্ষী অবলম্বনে রচিত বেশ কিছু ধাঁধারও সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বাংলায় পাখী অপেক্ষা পশু সংক্রান্ত ধাঁধার সংখ্যাই অধিক। অথচ উল্লেখযোগ্য, তুলনামূলক বিচারে বাংলা দেশে পশু অপেক্ষা পাখীর সংখ্যা কিংবা তাদের মনোরম বৈচিত্র্য নেহাৎ কম নয়। পশুদের মধ্যে আবার গরু সংক্রান্ত ধাঁধার সংখ্যাই সর্বাধিক। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে গরু একান্ত পরিচিত ও অপরিহার্য প্রাণী। তাই স্বভাবতঃই গাভী সংক্রান্ত ধাঁধার আধিক্য লক্ষিত হয়। গরু সংক্রান্ত ধাঁধাগুলিতে বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়েছে গরুর বাঁট, গরুর খুঁটি, গরুর লেজ, শিং প্রভৃতি। যেমন—

(ক) চারটে ঘড়া উপুড় করা
তার মধ্যে মধু পুরা। (গরুর বাঁট)

(খ) চাই চাই সটকা,
তিন সুর দশকা। (গরুর লেজ)

(গ) আগাত ডেম্ ডেম্ না মেলে পাতা,
যে ভাঙ্গি দিত্ না পারে তে জন্মের গাধা।
(গরুর শিং)

কুকুর ও বেড়াল—এই দুটি প্রাণীর সঙ্গে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের ঘনিষ্ঠ যোগ থাকা সত্ত্বেও এই দুটি প্রাণী অবলম্বনে কিন্তু তেমন উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ধাঁধা রচিত হতে দেখা যায় নি। অথচ সামান্য ইঁদুর, কাঠবেড়ালী কিংবা ঘোড়া, ছাগল, ভেড়া, বেঁজি, হরিণ, শূকর, শিয়াল, এমন কি হাতী, বাঘ প্রভৃতি জন্তু-জানোয়ার অবলম্বনে রচিত বহু ধাঁধা দেখতে পাওয়া যায়।

ক) ওপরে মাটি, নীচে মাটি
চলেছে যেন বাবুর বেটাটি। (ইঁদুর)

খ) বন থেকে বেরুল বাঘ
বাঘের গায়ে ছড়ির দাগ। (কাঠবেড়ালী)

গ) আল গুড়গুড়ি যায় বুড়ী
ফিরে ফিরে চায়। (বেঁজি)

ঘ) একটার উপর আর একটা যায়
কট্‌কটি নয় লোহা খায়। (ঘোড়া)

ঙ) আজার বেটি ধন্দল পেটি,
বিনা কোদালে খুঁড়ে মাটি। (শূকর)

চ) উঁচু পোঁতা গজমাথা
হয় ডাল তার না হয় পাতা। (হরিণ)

ছ) পথ বেয়ে বেয়ে যায়,
ফিরে ফিরে চায়। (শিয়াল)

সুন্দরবনের রয়েল বেঙ্গল টাইগার পৃথিবী বিখ্যাত। বাঘ বাঙ্গালীর

পরিচিত জীব, অথচ বাঘ বিষয়ক ধাঁধার সংখ্যা তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। বাঘ সংক্রান্ত একটি ধাঁধার উল্লেখ এই প্রসঙ্গে করা যেতে পারে—

বন্‌লে বাইরাল মুড়া,
গায়ে বেল মহাজন বুড়া। (বাঘ)

পশু সংক্রান্ত ধাঁধাগুলিতে লক্ষণীয়, স্বল্প পরিসর ক্ষেত্রে জন্তু বিশেষের প্রকৃতি অথবা আকৃতির বৈশিষ্ট্যটি উল্লিখিত হয়েছে। যেমন—কাঠবিড়ালীর গায়ের দাগ, শূকরের মাটি খোঁড়া, হরিণের শিঙ্‌, হাতীর স্থূলাকৃতি পা ইত্যাদি বিষয়গুলিই ধাঁধাগুলিতে স্থান পেয়েছে। এদিক দিয়ে বিচার করলে উট, ক্যাঙ্গারু, জিরাফ প্রভৃতির ন্যায় আরও বহুসংখ্যক বিচিত্র জন্তু-জানোয়ার আছে, যাদের আকৃতি ও প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অথচ সেগুলি অবলম্বনে ধাঁধা রচিত হয়নি। ধাঁধা সাধারণতঃ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও সেইসঙ্গে একান্ত পরিচিত বিষয় অবলম্বনেই রচিত হয়ে থাকে। জিরাফ, উট, ক্যাঙ্গারুর ন্যায় জন্তু অবলম্বনে যে কোন ধাঁধা রচিত হয়নি তার কারণ এই শ্রেণীর পশুগুলি বাংলা দেশের নয়, এগুলি সম্বন্ধে তাই এদেশের মানুষের ছিল প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অভাব। অথচ বাংলা প্রবাদের ক্ষেত্রে তুলনামূলক বিচারে জন্তু-জানোয়ার সম্পর্কিত প্রবাদের সংখ্যাধিক্যই কেবল নয়, সেই সঙ্গে বহু সংখ্যক বিচিত্র পশুকে স্থান দেওয়া হয়েছে। স্পষ্টতঃই বোঝা যায় যে, ধাঁধা রচনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন পশু সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতার অভাব ছিল, পরবর্তীকালে প্রবাদগুলি রচনাকালে তা দূরীভূত হয়েছিল। সিংহ, হাতী, ভাল্লুক থেকে শুরু করে গাধা, ঘোড়া, গরু, খরগোশ, খেঁকশেয়াল, শেয়াল, ছাগল, ছুঁচো, ইঁদুর, উট প্রভৃতি হরেক রকম পশু অবলম্বনে অসংখ্য প্রবাদ রচিত হয়েছে।

ধাঁধা রচনার ক্ষেত্রে আমাদের বহু পরিচিত কুকুর-বেড়ালকে তেমন উল্লেখযোগ্য স্থান দেওয়া হয় নি। কিন্তু সেই অভাব পূর্ণ হয়েছে প্রবাদের ক্ষেত্রে। আবার বেড়াল অপেক্ষা কুকুর সংক্রান্ত প্রবাদের সংখ্যাই অধিক। এর কারণ প্রবাদ দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা প্রসূত রচনা। এদিক দিয়ে বিচার করলে বেড়াল অপেক্ষা কুকুর সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতা অনেক বেশি।

আর সেই জন্যই কুকুর সংক্রান্ত প্রবাদের আধিক্য। কুকুর সংক্রান্ত প্রবাদ-গুলিতে কুকুরের বিভিন্ন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, বিশেষভাবে যেগুলি নিন্দনীয় সেগুলিই রূপায়িত হয়েছে। অথচ কুকুরের বিশ্বস্ততা, তীক্ষ্ণ ঘ্রাণশক্তি কিংবা প্রভুভক্তির পরিচয় প্রবাদগুলিতে অনুপস্থিত। কুকুর সংক্রান্ত কয়েকটি প্রবাদ উদ্ধার করা গেল—

ক) কুকুরের পেটে ঘি জরে না।

খ) কুকুরে ঘি-ভাত দিলে বমি করে মরে।
গাবুরে পিঁড়া দিলে চিৎ হয়ে পড়ে॥

গ) কুকুর রাজা হলেও জুতা খায়।

ঘ) কুকুরকে নাই দিলে মাথায় চড়ে।

ঙ) কুকুরের লেজ ঘি দিয়ে ডল্‌লেও সোজা হয় না।

চ) কসাইয়ের কুকুর নাড়ীভুঁড়িতেই তুষ্ট।

বেড়াল সংক্রান্ত প্রবাদগুলিতে বেড়ালের আকৃতি অপেক্ষা প্রকৃতির ওপরই অধিকতর গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে—

ক) আগে ছিলাম ছোঁচা বেরাল, ধর্মে দিয়েছি মন।
তুলসী মালা গলায় দিয়ে যাচ্ছি বৃন্দাবন॥

খ) এত রঙ্গ দেখলাম আমি বলাইয়ের ঘরে এসে।
মেনী বেরাল তুলো পেঁজে কলাবনে বসে॥

বেড়াল ষষ্ঠীর বাহন বলে পরিচিত। একটি প্রবাদে সেই পরিচয়টিও প্রকাশিত হয়েছে—

গ) ষষ্ঠীর বেড়াল।

বাঁদর অবলম্বনে তেমন উল্লেখযোগ্য ধাঁধা রচিত হতে দেখা যায় নি। কিন্তু এই প্রাণীটি প্রবাদের ক্ষেত্রে বেশ এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান লাভ করেছে—

ক) আদরে বাঁদর।

খ) কায়েতের বুদ্ধি আঁতে, বাঁদরের বুদ্ধি দাঁতে।

গ) বানরের হাতে ফুলের মালা।

বাংলা লোক-কথায় শৃগালের প্রায় রাজকীয় আধিপত্য। লোক-কথায় শৃগালকে পশুদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান প্রাণী বলে চিত্রিত করা হয়েছে। কিন্তু শেয়াল সম্পর্কিত প্রবাদগুলিতে তার ধূর্ততার দিকটি লক্ষণীয়ভাবে অনুপস্থিত—

ক) বনগাঁয়ে শেয়াল রাজা।

খ) দিনে শেয়াল, রাতে গাই, ডাকলে গাঁয়ের
রক্ষা নাই।

গ) মারতে পারে না বন্দুক ঘাড়ে, শেয়াল দেখলে চিৎ হয়ে পড়ে।

ঘ) কাগার শত্রু বগা, বগার শত্রু বাঘা। বাঘার শত্রু সিঙ্গি, সিঙ্গির শত্রু শেয়াল। শেয়ালের শত্রু মহাকাল।

কাঠবিড়ালী বিষয়ক প্রবাদে কাঠবিড়ালীর আকৃতি অথবা প্রকৃতি বিষয়ে কোন বক্তব্য প্রকাশের পরিবর্তে সীমিত শক্তিতে অসাধ্য সাধনের প্রয়াস সম্পর্কে সাধারণ বক্তব্য উপস্থাপিত হয়েছে—

ক) কাঠবিড়ালীর সাগর বাঁধা।

খ) কাঠবিড়ালীর বাগান ভাগ।

উট মরুভূমির জীব। পশু হিসাবে উট এক বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী এবং তা হল তার পিঠের কুঁজ। একটি প্রবাদে এই বিষয়টি প্রকাশ করা হয়েছে—

ক) উটের পিঠে কুঁজ, উট জানে না।

উট প্রচুর পরিমাণে যে জল সঞ্চয় করার ক্ষমতা রাখে, আর একটি প্রবাদে তারও উল্লেখ দেখা যায়—

খ) উটের পেটে জলের জালা, তবু তেষ্টায় ঝালাপালা।

হাতী সংক্রান্ত প্রবাদগুলিতে হাতীর স্থূলাকৃতি বিষয়েই বিশেষভাবে আলোকপাত করা হয়েছে—

ক) খেয়ে দেয়ে হাতী হওয়া।

খ) খিড়কি দিয়ে হাতী গলে সদরে বাঁধে ছুঁচ।

গ) কুঁড়ে ঘরে হাতি ঢোকান।

ভাল্লুক আমাদের আর এক পরিচিত জীব। এই প্রাণীটি, নাকি প্রায়ই জ্বরে ভোগে, আবার স্বাভাবিক নিয়মেই নিরাময় লাভ করে। একটি প্রবাদে তাই বলা হয়েছে—

ক) ভালুকের জ্বর।

বেশ কিছু মানুষ ভাল্লুক নাচিয়ে পয়সা উপার্জন করে। বলাবাহুল্য ভাল্লুক স্বতঃস্ফূর্তভাবে নাচে না, তাকে নাচতে বাধ্য করা হয়। একটি প্রবাদে তাই এই বিষয়ে বলা হয়েছে—

ঘ) ভাল্লুক কি নাচতে চায়, নাকে দড়ি দিয়ে নাচায়।

অনিচ্ছুক কোন ব্যক্তিকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কার্য সম্পাদনে বাধ্য করানো উপলক্ষে এই প্রবাদটি প্রযুক্ত হয়ে থাকে।

পশুরাজ সিংহ বিষয়ক প্রবাদে সিংহের পরস্পর বিপরীতমুখী পরিচয়টি প্রকাশিত হয়েছে—একদিকে তার শ্রেষ্ঠত্ব, অপর দিকে তার মূঢ়তা প্রবাদগুলিতে পরিস্ফুট—

ক) সিংহের ভাগ শৃগালে খায়।

খ) সিংহের সন্তান শৃগাল হয় না।

বাঘ সংক্রান্ত ধাঁধা উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় রচিত না হলেও প্রবাদের ক্ষেত্রে এই পশুটির অপ্রতিহত প্রতাপ লক্ষ্য করার মত—

ক) আউলে বাঘ জালে পড়ে।

খ) এক বনে দুই বাঘ।

গ) কচুবনে খটাশ বাঘ।

ঘ) বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা।

ঙ) বাঘে মোষে যুদ্ধ হয়, উলু খাগড়ার প্রাণ যায়।

চ) বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা।

ছ) বাঘ বুড়ো হলেও রূপ ছাড়ে না।

গাধা বিষয়ক প্রবাদে বিশেষভাবে গাধার নির্বুদ্ধিতাকেই প্রকটিত করা

হয়েছে। এছাড়া গাধা যে ভারবাহী পশু, সে বিষয়েও আলোকপাত করা হয়েছে।

ক) আধা কইলে গাধাও বোঝে, সব কইলে কেনা বোঝে।

খ) গাধা পিটিয়ে ঘোড়া।

গ) গাধা সকল বইতে পারে, ভাতের কাঠি বইতে নারে।

ঘ) ঘোড়ার পেট, গাধার পিঠ, খালি থাকে কদাচিৎ।

ছাগল সংক্রান্ত প্রবাদগুলিতে বিশেষ করে ছাগলের সীমিত শক্তি, নির্বুদ্ধিতা এবং সে যে সর্বভুক—এই সকল বিষয়ই স্থান পেয়েছে ঃ

ক) ছাগল দিয়ে যব মাড়ানো।

খ) ছাগল দিয়ে যদি হাল বইত, গরু লাগত না।

গ) ছাগুলে বুদ্ধি।

ঘ) ছাগলে কিনা খায়, পাগলে কিনা গায়।

বাংলা লোক-কথার তিনটি প্রধান বিভাগের অন্যতম উপকথা। উপকথায় যে দুটি পশু সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ স্থান পেয়েছে, সে দুটি পশু হল যথাক্রমে বাঘ এবং শৃগাল। বাঙালী যদিও সুন্দরবনের নরখাদক হিংস্র ও তীক্ষ্ণধার বুদ্ধির অধিকারী বাঘের সঙ্গে পরিচিত, তথাপি বাংলা উপকথায় বাঘকে চরম নির্বোধ, ভীরু ও কাপুরুষ রূপেই উপস্থাপিত করা হয়েছে। বলা যেতে পারে বাংলা উপকথায় বাঘ তার নিজস্ব ধর্ম থেকে ভ্রষ্ট এক ভিন্নতর প্রাণীরূপেই চিত্রিত। কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে বক্তব্যটিকে স্পষ্ট করা যেতে পারে। 'নিরেট বোকা' গল্পটিতে বর্ণিত হয়েছে এক শিয়াল ছাগল ছানা খেতে গিয়ে রাখালদের হাতে ধরা পড়ে যায়। রাখালেরা শেয়ালটিকে বেঁধে রেখে যায় পরে তাকে মারবে বলে। ইতিমধ্যে সেখানে একটি বাঘ এসে হাজির। সে শেয়ালকে বাঁধা অবস্থায় দেখে বিস্ময় প্রকাশ করলে শেয়াল জানায় যে সে বিয়ে করার অপেক্ষায় সেখানে রয়েছে; কিন্তু তার বিয়ে করার মোটেই ইচ্ছা নেই। বাঘ শেয়ালের কথা শুনে নিজে বিয়ে করতে চাইল। তাই শেয়ালের বাঁধন খুলে দিয়ে নিজে বাঁধা অবস্থায় রইল। পরে রাখালদের

কাছে বেদম প্রহার খেয়ে বোকা বাঘ বাঁধন ছিড়ে পালিয়ে কোনক্রমে প্রাণ বাঁচালে।

আর একবার বাঘ বনের এক জায়গায় হাজির হয়ে দেখলে শেয়াল করাতীদের গোঁজ মেরে রাখা আধচেরা একটা কাঠের ওপর বসে রয়েছে। বাঘও কাঠটির ওপর গিয়ে বসলে। শেয়াল সুযোগমত গোঁজটিকে খুলে নিলে বাঘের লেজ গেল কাঠের চেরা অংশে আটকে। বাঘ লাফ দিতে তার লেজটাই গেল ছিঁড়ে। এরপর শেয়াল ও বাঘ দুজনে একটা কচুবনে গিয়ে হাজির হল। শেয়াল চালাকি করে বাঘকে কচু খাওয়ালে। বাঘের মুখ কুট কুট করতে লাগল। এরপর শেয়ালের কথা বিশ্বাস করে বাঘ নিজের হাত-পা চিবিয়ে মুখ সারাতে চেষ্টা করল। কিন্তু শীঘ্রই বাঘের মৃত্যু হল। অর্থাৎ বার বার প্রতারিত হয়েও বাঘের চৈতন্যোদয় হ'ল না। মৃত্যু-বরণের মধ্য দিয়ে তার নির্বোধ জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটল। 'মামা-ভাগ্নে' গল্পটিতেও বেকুব বাঘকে শেয়ালের ছলনার জালে আবদ্ধ হয়ে অকালমৃত্যু বরণ করতে দেখা গেছে। একবার এক শেয়াল বাঘকে নিজের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করে এনে কিছুই খেতে দিলে না। বাঘও শেয়ালকে তার বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে এনে মোটা হাড় খেতে দিয়ে প্রতিশোধ নিলে। শেয়াল মনে মনে ঠিক করলে প্রতিশোধ নেবে। শেয়াল এক আখের খেতে খুব আখ খেত বলে চাষীরা তাকে ধরার জন্য একটা খোঁয়াড় তৈরী করলে। শেয়াল বাঘকে এসে বললে রাজার ছেলের বিয়েতে সে গাইতে যাবে। বাঘকে বাজাবার জন্যে শেয়াল আহ্বান জানালে। সে আরও বললে যে তাদের যাবার জন্যে রাজা স্বয়ং পাল্কী পাঠিয়েছেন। শেয়ালের কথা বিশ্বাস করে বাঘ আখের ক্ষেতে চাষীদের রাখা খোঁয়াড়কে পাল্কী মনে করে তার মধ্যে ঢুকতেই বন্দী হয়ে গেল। এরপর চাষীদের আঘাতে বাঘের মৃত্যু হল।

বাংলা উপকথায় বাঘকে এরূপ নির্বোধ রূপে চিত্রিত করার পেছনে পূর্ব-দক্ষিণ অর্থাৎ মালয়-ব্রহ্ম দেশের প্রভাবের কথা কেউ কেউ বলে থাকেন। সে যাই হোক, মনস্তাত্ত্বিক কারণ বিশ্লেষণ করে বলা যায়, যে বাঘের কারণে বাঙালী জীবন নানাভাবে পর্যুদস্ত (সুন্দরবন অঞ্চলের), বহু জীবন অকালে

বিনষ্ট হয়, বাংলা উপকথায় তার জীবনের অভিশাপ রূপ সেই বাঘকে নির্বোধ ও প্রতিটি ক্ষেত্রে তাকে পরাজিত করে যেন অনেকাংশে তার প্রতিশোধ স্পৃহাকেই পূর্ণ করেছে।

পাশ্চাত্য সমালোচক Sten Konow অভিমত প্রকাশ করে বলেছেন যে শিয়ালকে পণ্ডিত হিসাবে দেখাবার পশ্চাতে রয়েছে ইন্দো-ইউরোপীয় জাতির দান, অপর পক্ষে তার বিশ্বাসঘাতকতা Proto—Australoid জাতির প্রভাবের ফল।

বাংলা লোক-সাহিত্য চর্চায় বিদেশীয়দের দান

কথায় বলে "মা'র চেয়ে মাসীর দরদ বেশী।" অর্থাৎ যেখানে সন্তানের প্রতি বাঞ্ছিত অপত্যস্নেহের প্রকাশ মাতৃ হৃদয় থেকে উৎসারিত হওয়া কর্তব্য, সেখানে তৎপরিবর্তে মাসীর হৃদয় থেকে যদি সেই স্নেহ ও দুর্বলতার অভিব্যক্তি ঘটে, তখন সেটা কিছু পরিমাণে অস্বাভাবিক বলে প্রতিভাত হয় সঙ্গত কারণে। কিন্তু এ' রকম অস্বাভাবিকতা বিরল হলেও অসম্ভব বোধকরি বলা যায় না। অসম্ভব যে বলা যায় না, তার প্রমাণ স্বরূপ বাংলা লোক-সাহিত্য চর্চায় বিদেশীয়দের দানের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

বাংলা লোক-সাহিত্য বাঙ্গালীর নিজস্ব সম্পদ। এই সম্পদ সংরক্ষণ ও সংগ্রহে তাই বাঙ্গালীরই প্রয়াস যুক্ত হওয়া কর্তব্য এবং তা বাঙ্গালীর নিজেরই স্বার্থে। কিন্তু বাংলা লোক-সাহিত্য চর্চার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বাঙ্গালীর তুলনায় এ' ব্যাপারে বিদেশীয়দের প্রয়াস উল্লেখযোগ্য ভাবে যুক্ত হয়েছে—অবশ্য সেটা লোক-সাহিত্য চর্চার একেবারে প্রথম দিকে। সাধারণতঃ আমরা বলে থাকি যে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাংলা ছড়া সম্পর্কিত আলোচনাকে কেন্দ্র করেই বাংলা লোক-সাহিত্য চর্চার শুভ সূত্রপাত ঘটেছিল, ১৩০১ বঙ্গাব্দে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অদ্বিতীয় আলোচনার মাধ্যমে বাঙ্গালীকে বাংলা লোক-সাহিত্য বিষয়ে অবহিত করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু তারও বহু

পূর্ব থেকেই শুরু হয়েছিল বাংলা লোক-সাহিত্যের বিভিন্ন উপকরণ সংগ্রহ ও ক্ষেত্র বিশেষে তুলনামূলক আলোচনা। বর্তমান নিবন্ধে আমরা এই চর্চায় বিদেশীয়দের দান বিষয়েই বিশেষভাবে আলোকপাত করার চেষ্টা করব। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখ করা যেতে পারে যে লোক-সাহিত্যের বিভিন্ন উপকরণের মধ্যে প্রবাদ এবং লোক-কথার সংগ্রহ এবং আলেচনাতেই বিশেষভাবে বিদেশীয়দের প্রয়াস যুক্ত হয়েছিল। ধাঁধা, ছড়া, গান ইত্যাদি সংগ্রহ ও আলোচনায় বিদেশীয়দের কোন প্রয়াস যুক্ত হয় নি।

পাশ্চাত্য প্রভাবে প্রভাবিত বাঙ্গালী যখন অন্ধ পরানুকরণের মোহে আচ্ছন্ন, জাতীয় সংস্কৃতির অপরিহার্য অঙ্গস্বরূপ যে লোক-সাহিত্য ও লোক-সংস্কৃতি তা ছিল অবহেলিত, সেই সময়ে রেভারেণ্ড উইলিয়াম মর্টন নামে এক বিদেশী পাদ্রী—'দৃষ্টান্ত বাক্য সংগ্রহ' নামে প্রবাদের একটি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করেন ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে। এই সংকলনটিতে ৮০৩টি বাংলা প্রবাদ এবং ৭০টি সংস্কৃত প্রবাদের ইংরেজি অনুবাদ সন্নিবিষ্ট হয়েছিল।

এ' পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে মর্টনকেই বাংলা প্রবাদ সংগ্রহের প্রথম পথিকৃতের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করতে হয়। আর বাংলা লোক-সাহিত্যের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে প্রবাদ সংগ্রহের মাধ্যমেই লোক-সাহিত্য চর্চার সূত্রপাত হয়েছিল এই প্রসঙ্গে সেটা উল্লেখযোগ্য। মর্টন পরবর্তীকালে অর্থাৎ 'দৃষ্টান্ত বাক্য সংগ্রহ' প্রকাশের কয়েক বছর পরেই 'Calcutta Christian Observer' পত্রিকায় আরও দেড় শতাধিক বাংলা প্রবাদ প্রকাশ করেন [Christian observer ; vol IV, 1835 PP 177—7, 303—7, 532—37, 590—94]

মর্টন যে খুব সাহিত্য-রসিক ছিলেন তা কিন্তু নয়, আবার তিনি যে আমাদের দেশের সংস্কৃতির একনিষ্ঠ অনুরাগী ছিলেন তাও নয়। মর্টন ছিলেন একজন সিনিয়র মিশনারী। এ'দেশে এসেছিলেন তিনি খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করতে। বিদেশে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করাই ছিল তাঁর জীবনের মূল ব্রত। ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের নরদামটন সায়ারের কয়েকজন ব্যাপটিস্ট মিশনারী ভারতে খ্রীষ্টানধর্ম প্রচারের জন্য এসেছিলেন, যেমন এসেছিলেন কেরী, ওয়ার্ড,

গ্রান্ট, মার্শম্যান প্রমুখেরা। মর্টনও এই একই প্রয়াসের শরিক হয়েই এসেছিলেন। মর্টনের বাংলা প্রবাদ সংকলন ও তার ইংরেজি ব্যাখ্যার কারণ তাঁর গ্রন্থ প্রকাশের ঠিক দু'বছর আগে অপর একজন খ্যাতনামা পাদ্রী মার্শম্যানের প্রকাশিত বক্তব্যের অংশ বিশেষের মাধ্যমে জানা যাবে। মার্শম্যান লিখেছেন :

1) With the hope of aiding the researches of our countrymen into the popular language of Bengal; 2) They will furnish the English student with a key to many of the popular sayings which be finds in his inter-course with the people of this province, and also explain many of the maxims which have exercised a very cansiderable influence on the habits and conduct of the natives!

অবশ্য মার্শম্যান যে মর্টনের সঙ্কলন প্রসঙ্গে এই অভিমত প্রকাশ করেন নি, তা বলা নিষ্প্রয়োজন। নীলরত্ন হালদারের 'কবিতা-রত্নাকর' নামে একটি প্রবাদ সঙ্কলনের ভূমিকায় তিনি উদ্ধৃত মন্তব্যটি প্রকাশ করেছিলেন। নীল-রত্ন হালদারের গ্রন্থটি ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। কিন্তু এটি ছিল সংস্কৃত প্রবাদের সঙ্কলন। তাই বাংলা প্রবাদ চর্চায় প্রথম পথিকৃতের স্থান বিদেশীয় মর্টনেরই।

মর্টন মার্শম্যানের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে 'দৃষ্টান্ত বাক্য সংগ্রহ' প্রকাশ করেছিলেন—এরূপ অনুমান করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। মার্শম্যান এবং মর্টন দু'জনেই ছিলেন মিশনারী এবং একই আদর্শে উৎসর্গীকৃত প্রাণ। এ ছাড়াও মার্শম্যান কর্তৃক নীলরত্ন হালদারের প্রবাদ সঙ্কলনটির দ্বিতীয় সংস্করণে (১৮৩০) ইংরেজিতে ভূমিকা এবং সঙ্কলিত প্রবাদগুলির ইংরেজি অনুবাদ সন্নিবিষ্ট করার ঠিক দু'বছর পরেই—মর্টনকে দেখা গেল বাংলা প্রবাদ সঙ্কলনে ব্রতী হতে। মর্টনের সঙ্কলনে তাই মার্শম্যানের প্রভাব সুস্পষ্ট। অবশ্য সূচনার কথা বাদ দিলে নিছক প্রবাদ সঙ্কলন হিসাবে অপর একজন মিশনারী ভারত-প্রেমিক রেভারেণ্ড লঙের 'প্রবাদমালা' (১৮৬৮-১৮৬৯, ১৮৭২) যে

গুরুত্বের অধিকারী, মর্টনের গ্রন্থে সেই গুরুত্ব কিন্তু অনুপস্থিত। লঙের 'প্রবাদমালা' প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনার পূর্বে অন্যান্য কয়েকজন বিদেশীর প্রসঙ্গে উল্লেখ করে নেওয়া যেতে পারে। এঁদের একজন হলেন Captain T. H Lewin এবং অপরজন J. D. Anderson। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে Lewin-এর "Hill Proverbs of the Inhabitants of Chittag ng Hill Tracts" প্রকাশিত হয়।

J. D Anderson ছিলেন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী। চট্টগ্রামের উপভাষার নিদর্শন স্বরূপ চট্টগ্রামে প্রচলিত ৩৫২টি প্রবাদের ইংরেজি অনুবাদ টিপ্পনী-সহ প্রকাশিত হয় ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে। Anderson-এর গ্রন্থটির নাম "Some Chittagong Proverbs"। Anderson চট্টগ্রাম অঞ্চল থেকে সংগৃহীত প্রবাদগুলিকে বোধগম্য করার জন্য প্রবাদগুলির ভাষাকে অবশ্য ইচ্ছাকৃত ভাবে পরিবর্তিত করেছেন। এর ফলে সংগ্রহ কিছুটা ত্রুটিপূর্ণ হয়ে গেছে।

রেভারেণ্ড লঙ্ প্রণীত 'প্রবাদমালা' প্রকাশিত হয় ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে। গ্রন্থের আখ্যান পত্রে যদিও বলা হয়েছে 'Two thousand Bengali Proverbs Illustrating native life and feeling', কিন্তু প্রকৃতপক্ষে গ্রন্থটিতে ২৩৫৮টি প্রবাদ সঙ্কলিত হয়েছে। প্রবাদগুলি বর্ণমালার ক্রম পরম্পরায় সাজানো। আখ্যান পত্রে লেখক বা সঙ্কলক হিসাবে লঙ্ সাহেবের নাম কিন্তু মুদ্রিত হয় নি। তবু এ গ্রন্থটি যে লঙ্ সাহেবের রচনা, 'প্রবাদমালা'র পরবর্তী খণ্ডেই তা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত। গ্রন্থটি রচিত হয়েছিল 'Calcutta Literature Society'র জন্য।

'প্রবাদমালা'র ২য় ভাগ প্রকাশিত হয় ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে। দ্বিতীয় ভাগটি প্রকাশিত হয় 'Calcutta School Book and Vernacular Literature Society'র দ্বারা। গ্রন্থটির আখ্যান পত্রে মুদ্রিত হয়েছে : 'Proverbs of Europe and Asia Translated into the Bengali Language ইউরোপ ও এস্যা খণ্ডস্থ প্রবাদমালা। দ্বিতীয় ভাগ। বঙ্গীয় ভাষায় অনুবাদিত।'

'প্রবাদমালা'র প্রথম খণ্ডে লঙ্‌ সাহেবের নাম অথবা ভূমিকাস্বরূপ কিছু মুদ্রিত না হলেও দ্বিতীয় খণ্ডে ইংরেজিতে একটা ভূমিকা প্রকাশিত হয়েছে লঙের নিজের নামে। ভূমিকায় লঙ্‌ বলেছেন :

'The following contains a free translation into Bengali by Babu Rangalal Banerjee of Proverbs selected by me from the German, Italian, Spanism, Portuguese, Dutch, French, Badagar, Malaylim, Tamul, Chinese, Panjabi, Mahratta, Hindi, Orissa, and Russian languages'—অর্থাৎ দ্বিতীয়ভাগে সন্নিবিষ্ট লঙ্‌ নির্বাচিত বিভিন্ন দেশী ও বিদেশী প্রবাদের বঙ্গানুবাদ কবিবর রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত। এ'রূপ সঙ্কলনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লঙের মন্তব্য—

'The object is to introduce to the notice of the Bengali people the wit wisdom in other parts of the world, the Russian Proverbs 200 in number though last in the series will not be found the least in their wit and keen sarcasm.'

সর্বমোট ৯৭৯টি প্রবাদ সঙ্কলনটিতে স্থান পেয়েছে। এই সংকলনটির বৈশিষ্ট্য হল বিদেশী যে সকল প্রবাদের সঙ্গে বাংলা প্রবাদের গভীর সাদৃশ্য আছে, সে'ক্ষেত্রে প্রচলিত বাংলা প্রবাদটিও অনুবাদের সঙ্গে উল্লেখ করে তুলনামূলক আলোচনার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে।

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে লঙ্‌ সাহেবের সম্পাদনায় প্রবাদের আর একটি সঙ্কলন প্রকাশিত হয়েছে। এটিরও নাম 'প্রবাদমালা'। এই সঙ্কলনটিতে সর্বমোট ৩৪২৯টি প্রবাদ স্থান পেয়েছে। লঙ্‌ গ্রন্থটির ভূমিকায় বলেছেন :

'This little work complete the series of Proverbs and Proverbial sayings of Bengal '।—লঙ্‌ সাহেবের এই মন্তব্য থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে 'প্রবাদমালা'র তিনটি খণ্ডই লঙ্‌ সাহেবের সঙ্কলিত এবং তাঁর একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার বাস্তব রূপায়ণ। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে প্রকাশিত সংকলনটির আখ্যান পত্রে মুদ্রিত হয়েছে :

'Three Thousand Bengali proverbs and proverbial sayings. Illustrating Native Life and Feeling among Ryots and women'।

এই সংকলনটিতে বেশ কিছু সংস্কৃত প্রবাদও স্থান পেয়েছে। এ পর্যন্ত গেল বাংলা প্রবাদ সংগ্রহ ও প্রকাশে বিদেশীয়দের প্রয়াসের কথা। এইবার আসা যেতে পারে বাংলা লোক-কথা চর্চায় বিদেশীয়দের কি পরিমাণ প্রয়াস যুক্ত হয়েছিল সেই সম্পর্কিত আলোচনায়।

বহুকাল পূর্ব থেকেই পাশ্চাত্য পণ্ডিত ও গবেষকদের এ'রকম এক ধারণা বদ্ধমূল হয়েছিল যে ভারত উপ-মহাদেশ লোক-কাহিনীতে সমৃদ্ধ। তাই ইংরেজ কর্মচারী, কর্মচারীদের আত্মীয়-স্বজন এবং ইউরোপীয় মিশনারীরা এদেশের নৃতত্ত্ব ও জাতিতত্ত্ব সম্পর্কিত নানাবিধ তথ্যাদি সংগ্রহের সময় লোক-কাহিনী সংগ্রহেও ব্যাপৃত ছিলেন। আর এঁদের মধ্যে অনেকেই তৎকালীন প্রচলিত লোক-কাহিনীর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পঠন-পাঠন ও সংগ্রহ রীতির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। তবে ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চল থেকে লোক-কথা সংগ্রহে বিদেশীয়দের যে পরিমাণ উদ্যম নিযুক্ত হয়েছিল, সে পরিমাণ উদ্যম বাংলাদেশের লোক-কাহিনী সংগ্রহে নিযুক্ত হতে দেখা যায় নি প্রথমেই এ'কথা স্বীকার করে নেওয়া ভাল।

বাংলাদেশে লোক-কাহিনী সংগ্রহের সূত্রপাত ঘটে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে। কলকাতা থেকে এই সময় প্রকাশিত হয় 'The Indian Antiquary' এবং 'Descriptive Ethnology of Bengal'। Antiquary-তে প্রকাশকাল থেকেই বাংলা লোক-কাহিনীর বিভিন্ন উপকরণ প্রকাশিত হয়েছিল। এই পত্রিকা প্রসঙ্গে বিশেষভাবে যাঁর নাম স্মরণ করতে হয়, তিনি হলেন জি, এইচ ড্যামান্ট। ড্যামান্ট এই পত্রিকায় সর্বমোট ২২টি উপকথা ও পরীকাহিনী প্রকাশ করেন। সত্যিকথা বলতে কি ড্যামান্ট-ই বাংলাদেশের লোক-কাহিনীকে পাশ্চাত্য দেশের মানুষের সামনে তুলে ধরেন। বাংলা সরকারের পক্ষ থেকে প্রকাশিত 'Descriptive Ethnology of Bengal' গ্রন্থটিও বাংলা লোক-কাহিনী সংগ্রহ ও চর্চার ইতিহাসে একটা উল্লেখযোগ্য

ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। এই গ্রন্থটির সঙ্গে যুক্ত উল্লেখযোগ্য নামটি হ'ল Edward Tweit Delton। অবশ্য একথা ঠিক যে ডেল্টন ড্যামাণ্টের মত যত না লোক-কাহিনী সংগ্রহের ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন, সে তুলনায় তাঁর বেশি লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশের জাতি-তাত্ত্বিক জরিপ পরিচালনায়। ড্যামাণ্ট বা ডেল্টন—এঁরা কেউই বাংলা লোক-কাহিনীর তুলমামূলক আলোচনায় প্রবৃত্ত হন নি। কিন্তু তবুও ড্যামাণ্ট এবং ডেল্টনের নাম বাংলা লোক-কাহিনী সংগ্রহ ও চর্চার ইতিহাসে শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লিখিত হবে। এইবার একজন ইউরোপীয়নের উল্লেখ করা যেতে পারে যিনি নিজে বাংলা লোক-কথা সংগ্রহ না করলেও লোক-কাহিনী সংগ্রহে অপর একজনকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। ইনি—আর. সি. টেম্পল। রেভারেণ্ড লালবিহারী দে'র বহু খ্যাত 'Folk tales of Bengal' গ্রন্থটি রচনার মূলে যে টেম্পলের প্রেরণা বিশেষভাবে কার্যকরী হয়েছিল তা লালবিহারীর উক্তি থেকেই জানা যায় ঃ

'Captain Temple wrote to me to say how interesting it would be to get a collection of the unwritten stories which old women recite to children in the evenings, and to ask whether I could not make a collection'।

উল্লেখ করা যেতে পারে লালবিহারী তাঁর গ্রন্থটি টেম্পলকেই উৎসর্গ করেছিলেন।

বাঙ্গালীদের জাতিতত্ত্বের পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে ডেল্টনের পর যিনি স্মরণীয় অবদান রেখে গেছেন, তিনি হলেন এইচ. এইচ. রিস্‌লে। রিস্‌লে রচিত 'The Tribes and customs of Bengal' গ্রন্থটি ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে বাংলাদেশের জনগোষ্ঠী সম্পর্কিত বহুবিধ প্রয়োজনীয় তথ্যাদির সঙ্গে স্থানীয় কাহিনী ও লোক-কাহিনীও প্রকাশিত হয়েছিল।

'Bengali House-hold Tales' রচয়িতা উইলিয়াম ম্যাক্‌কুলোচ ছিলেন নিম্নবঙ্গের United Free Church-এর একজন ভূতপূর্ব মিশনারী। এঁর গ্রন্থটি ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন থেকে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে বিভিন্ন

শ্রেণীর মোট ২৮টি কাহিনী স্থানলাভ করেছে। কাহিনীগুলি বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চল থেকে সংগৃহীত। সঙ্কলিত প্রতিটি কাহিনীর সঙ্গে পূর্বভারত থেকে সংগৃহীত সমান্তরাল কাহিনী উল্লিখিত হয়েছে। কাহিনীগুলি সম্পূর্ণ ভাবে মৌখিক ঐতিহ্য থেকে সংগৃহীত। সর্বোপরি পাণ্ডিত্যপূর্ণ পরিশিষ্টের সংযোজন সংকলনটির মর্যাদাকে বিশেষভাবে বৃদ্ধি করেছে।

পরিশেষে বাংলা লোক-সাহিত্য চর্চায় আত্মনিয়োগকারী আরো কয়েকজন বিদশীয় সম্পর্কে আলোকপাত করা গেল। বাংলা মৌখিক সাহিত্যের প্রাচীনতম সংগ্রাহকদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য একটি নাম 'Linguistic Survey of India' গ্রন্থের সম্পাদক ভাষাতত্ত্ববিদ পণ্ডিত স্যার জর্জ গ্রীয়ারসন (১৮৫১-১৯৪১)। গ্রীয়ারসন ১৮৭৩-এ ভারতে আসেন। ডবলিন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালেই তিনি সংস্কৃত ও হিন্দুস্থানী ভাষা শিক্ষায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। ১৮৭৩ থেকে ১৮৮৮ সাল পর্যন্ত তিনি তৎকালীন বাংলা প্রদেশের (বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা) বিভিন্ন অঞ্চল পর্যটন করেন। সংস্কৃত, পুরাতন হিন্দী, মৈথিলী, ভোজপুরী, ছত্তিশগড়ী এবং বাংলা ইত্যাদি কথ্য ভাষার অনুশীলনে ইনি ব্যাপৃত ছিলেন। সরকারী কার্যোপলক্ষে ইনি বর্তমান বাংলাদেশস্থ রংপুরে অবস্থান কালে ময়নামতীর এক পালাগান সংগ্রহ করেন এবং ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে 'মানিকচন্দ্র রাজার গান' নামকরণ করে তা প্রকাশ করেন। এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে গ্রীয়ারসন সংগৃহীত ময়নামতীর পালাগানটি ইংরেজি অনুবাদসহ দেবনাগরী অক্ষরে মুদ্রিত হয়েছিল। পরে ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে এই পালা গানের কিছু অংশ উদ্ধৃত করেন ও আলোচনা করেন।

সাম্প্রতিককালে বাংলা লোক-সাহিত্য চর্চায় আত্মনিয়োগকারী একজন বিদেশী হলেন Dr Dusan Zbavitel। ইনি একজন প্রতিষ্ঠিত চেক পণ্ডিত। ময়মনসিংহ থেকে প্রাপ্ত গীতিকা গুলি নিয়ে ইনি উল্লেখযোগ্য আলোচনা করেছেন এঁর 'Bengali Folk-Ballads From Mymensingh' গ্রন্থে (১৯৬৩)। ময়মনসিংহ থেকে প্রাপ্ত গীতিকাগুলির প্রামাণিকতা বিচার করেছেন লেখক। তাছাড়া গীতিকাগুলির বিষয়বস্তু, গঠন শৈলী, আঙ্গিকগত

সাদৃশ্য, হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতির প্রতিফলন, গীতিকাগুলির গায়কগণ, গীতিকায় প্রতিফলিত প্রকৃতি, এগুলির ছন্দ এবং অলংকার নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা করেছেন তিনি।

লেখক যে বলেছেন 'Among Bengalis themselves—no foreigner has to my knowledge, made any contribution in this field so far.'

—বাস্তবিক সত্য এবং গীতিকাআলোচনায় আলোচ্য গ্রন্থটি শুধু অপরিহার্যই নয়, একটি অত্যন্ত মূল্যবান ও নির্ভরযোগ্য সংযোজনের গৌরবে গৌরবান্বিত বলে স্বীকার করতে হয়।

প্রখ্যাত জার্মান পণ্ডিত Dr. Heinze Mode এবং এদেশীয় অরুণ কমার রায়ের যুগ্ম প্রয়াসে রচিত 'Bratakathas' (Bengalische Erzahlungen) এবং 'Bengalische Marchen' নামক গ্রন্থদুটি প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৯৬৪ এবং ১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দে। বাংলা ব্রতকথা এবং লোক-কথা চর্চার ক্ষেত্রে জার্মান ভাষায় রচিত এই গ্রন্থদু'টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন।

এইভাবে বাংলা লোক-সাহিত্য চর্চায় বিদেশীয়দের প্রয়াস বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল। তাই আজ যখন লোক-সাহিত্য চর্চায় বিশেষ আগ্রহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে, তখন এইসব বিদেশীয়দের দান সম্পর্কে একটু দৃষ্টিপাত করা গেল।

বাংলাদেশের কয়েকটি আঞ্চলিক লোক-উৎসব

উৎসবমুখর বাংলাদেশ। এখানে বারো মাসে তেরো পার্বণ। বাস্তবিক, বাংলাদেশের উৎসবকলা এক সঙ্গে যেমন রমনীয়, বৈচিত্র্য-পূর্ণ তেমনই আকর্ষণীয়। আমরা বাংলাদেশে প্রচলিত বিশেষ বিশেষ কয়েকটি পুজো পার্বণের সঙ্গেই পরিচিত মাত্র। কিন্তু বাংলাদেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে বৎসরের বিভিন্ন সময়ে যে বিবিধ প্রকার পুজো-পার্বণ, আচার অনুষ্ঠানাদি অন্তরের সুগভীর বিশ্বাস এবং ঐকান্তিক নিষ্ঠার সঙ্গে পালিত হয়ে থাকে, তার সঙ্গে মুষ্টিমেয় মানুষই পরিচিত। সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই সব উৎসবকলা ক্রমেই চলেছে অবলুপ্তির পথে, উৎসবমুখর বাংলাদেশের বহু প্রাচীন পুজো-পার্বণই আজ অতীত স্মৃতিতে পর্যবসিত

'রহিণ পুজো' বাংলাদেশের একটি উল্লেখযোগ্য আঞ্চলিক পুজো। সর্পসঙ্কুল বাংলাদেশের মানুষের সর্পভীতি থেকে সৃষ্ট এই পুজোটি মনসা পুজারই নামান্তর মাত্র। মেদিনীপুর জেলায় এই রোহিণ পুজো জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম তেরদিন একটানা আড়ম্বরের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। কিন্তু পুরুলিয়া জেলায় কেবলমাত্র জ্যৈষ্ঠ মাসের তেরো তারিখটিতেই এই পুজোটি অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়। উল্লেখযোগ্য, পুজোর উদ্দেশ্য উভয় জেলাতেই এক হলেও পুজো পদ্ধতি কিন্তু সম্পূর্ণ পৃথক। মেদিনীপুরের পুজো পদ্ধতির কথাই প্রথমে উল্লেখ করা যেতে পারে। এ অঞ্চলে 'রহিণ-পুজো'র

অপরিহার্য উপকরণ হিসাবে পুজোর স্থানে একটি থালায় কিছু জ্বলন্ত টিকে রেখে দেওয়া হয়। আর ঐ আগুনে দেওয়া হয় প্রচুর ধুনো। 'ধূপর' বা পুরোহিত প্রথমে ঐ আগুন এক নিঃশ্বাসে শুষে নেন বা নিভিয়ে ফেলেন। তারপরই শুরু হয় মনসামঙ্গলের কথা।

কিন্তু পুরুলিয়া জেলায় 'রহিণ পুজো' পদ্ধতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। এখানে 'রহিণ পুজো' উপলক্ষ্যে গৃহস্বামী বিকালে কাচা কাপড় পরে নিজের নিজের চাষের জমি থেকে ঝুড়ি করে মাটি সংগ্রহ করে নিয়ে আসেন। মাটি আনার সময় কয়েকটি আচার বিশেষভাবে পালিত হতে দেখা যায়।

প্রথমত, মাটি আনার সময়ে গৃহস্বামী সম্পূর্ণরূপে মৌনতা অবলম্বন করেন। দ্বিতীয়ত, কাচা কাপড় অথবা গামছার দ্বারা ঢেকে নিয়ে ঐ মাটি মাথায় চাপিয়ে আনা হয়। মাটি আনার পর ঐ মাটি পবিত্র স্থানে—'দেবতার থানে' অথবা তুলসীর মূলে দিয়ে দেওয়া হয়। তারপর তুলসীতলা থেকে ঐ মাটি নিয়ে প্রতিটি ঘরে এমনকি গোয়াল ঘরেরও চালের তলায় সযত্নে রেখে দেওয়া হয়। পুজোর দিন রাত্রে গৃহস্বামী ভাতের পরিবর্তে দুধ, চিঁড়ে ও 'রহিণ ফল' সর্পদেবী মা মনসার নাম ভক্তিভরে স্মরণ করে ভোজন করেন। স্থানীয় সংস্কার অনুযায়ী সর্পদষ্ট ব্যক্তির ক্ষতস্থানে 'রহিণ পুজো' উপলক্ষ্যে আনীত মাটি দিলে সহজেই ঐ ব্যক্তি নিরাময় হয়ে ওঠে। পুরুলিয়ার ওঝাগণও সর্পাঘাতে আহত ব্যক্তিদের চিকিৎসাকালে ঐ মাটি ব্যবহার করে থাকেন। আর এই পুজো উপলক্ষে ১৩ই জৈষ্ঠ থেকে আশ্বিন মাসের সংক্রান্তি পর্যন্ত প্রত্যেক দিন রাত্রে নিয়মিতভাবে 'মনসা মঙ্গল' গান গীত হয়ে থাকে। এতদঞ্চলের অধিবাসীদের বিশ্বাস অনুযায়ী 'রহিণ পুজো'র দিন সকল প্রকার সাপ গর্ত থেকে বাইরে বেরিয়ে আসে। পুনরায় আশ্বিন মাসের সংক্রান্তির মধ্যে সে সাপ গর্তে আশ্রয় নেয়। 'রহিণ-পূজা'র দিন বৃষ্টি হলে নাকি সাপেদের আর বিষ থাকে না।

শ্রাবণ মাসের যে কোনও শনি অথবা মঙ্গলবারে অপর একটি পূজানুষ্ঠানও পুরুলিয়া জেলার প্রায় সর্বত্রই অত্যন্ত আড়ম্বরের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এটি স্থানীয় অঞ্চলে 'খইচেরা' নামে পরিচিত। এটিও আসলে সর্পদেবী

মনসার পুজো। 'খইচেরা'র দিন সকল প্রকার সাংসারিক কাজ-কর্ম ও চাষ-বাস বন্ধ রাখা হয়। খইচেরার দিন মনসা গাছ থেকে একটি ডাল ভেঙ্গে এনে সেটিকে তুলসী তলায় পুঁতে দিয়ে ভক্তি সহকারে পুজো করা হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গৃহস্থ স্বয়ং এই পুজো করে থাকেন। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণের দ্বারাও এই পুজো অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়।

পূজার উপকরণ হিসাবে আমলকী পাতা, বেল পাতা, জবাফুল, করবীফুল প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। এই দিনটিতে গৃহস্থেরা ভাতের পরিবর্তে দু'বেলাই চিঁড়ে, মুড়ি, খই প্রভৃতি আহার করেন। রাত্রে হয় 'মনসা মঙ্গলে'র গান। 'মনসা মঙ্গল' গানের সঙ্গে বাজে 'বিষম ঢাক' নামক এক প্রকার বাজনা। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ রচিত 'মনসা মঙ্গল'ই এ অঞ্চলের বহু পঠিত ও প্রচলিত মঙ্গল কাব্য।

পুরুলিয়া জেলার অন্তর্গত 'ভসমকাটা' নামক স্থানে এক আঞ্চলিক দেবীর পূজানুষ্ঠানের রীতি প্রচলিত পয়লা মাঘ তারিখটিতে। ইনি স্থানীয় অধি-বাসীদের কাছে পরিচিত 'চড়কাসিনি দেবী' নামে। এই দেবীর নিজস্ব কোন মূর্তি নেই। একটি প্রস্তর খণ্ডকেই দেবীরূপে কল্পনা করে পুজো করা হয়ে থাকে। দেবীর পূজার্চনার অব্যবহিত পূর্বে একটি বিশেষ প্রথা অনুসৃত হতে দেখা যায়। একটি পাথরকে 'বিছাল' দড়ির দ্বারা বেঁধে দেবীর চালাঘরের সম্মুখে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। পাথরটি আপনা থেকে মাটিতে পড়ে গেলে তবেই দেবীর পুজো আরম্ভ হয়। প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী পাথরটি পড়ার মাধ্যমেই দেবীর আবির্ভাব সূচিত হয়।

সমগ্র পুরুলিয়া জেলার নানা স্থানেই ভাদ্রমাসের রাধাষ্টমীর পরের শ্রবণানক্ষত্রযুক্ত দ্বাদশীতে অত্যন্ত আড়ম্বরের সঙ্গে যে পুজোটি অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে সেটি ইন্দ্রপূজা। স্থানীয় নাম ইন্দ্রপুজো বা ইদপুজো। এই পূজোটি একান্তভাবেই রাজা, জমিদার বা ভূস্বামীদের, স্বভাবতঃই তাই পুজোর সংখ্যা অত্যন্ত সীমিত। পূজার ব্যয়-বাহুল্যের জন্যই সম্ভবত পুজোটি রাজা, জমিদার অথবা ভূস্বামীদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। তদুপরি দেবরাজ ইন্দ্রের আরাধনার অধিকার থেকে সাধারণ প্রজা-রাইয়ত প্রভৃতিদের বঞ্চিতও করা

হয়ে থাকতে পারে। তবে ভূস্বামীদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হলেও সাধারণ মানুষও এই পূজানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে প্রভূত আনন্দলাভ করে থাকেন। রাধাষ্টমীর দিন দুটি শাল গাছ কাটা হয়—একটি বাড়ীর এবং অপরটি বাড়ীর বাইরের পূজার জন্য। বাড়ীর গাছটি লম্বায় সোয়া দু'হাতের কম হয় না। কিন্তু বাইরের জন্য যে গাছটি কাটা হয়, সেটি লম্বায় প্রায় ৪০/৫০ হাত হয়ে থাকে। এটিকে বাইরের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে স্থাপন করা হয়। যারা শালগাছ কেটে আনে, তারা 'ঘিরা' বা 'শবর' নামে পরিচিত। গাছ কাটার আগে শবররা প্রথমে বনদেবীর পূজার্চনা করে। ইন্দ্র পূজার জন্য আবার যে কোন শালগাছ হলে চলে না। এর জন্য এমন গাছের প্রয়োজন, যার কোন ডালপালা থাকে না। পূজার জন্য প্রয়োজন কেবলমাত্র মূল গাছটার।

ইন্দ্‌পুজোর আগের পনের দিন, কমপক্ষে এক সপ্তাহ যাবৎ একবেলা নিরামিষ আহার করতে হয়। পূজার ঠিক আগের দিন রাত্রে হয় অধিবাস—এর নাম 'আধাগাছি' বা 'আদগাছি'। 'আধাগাছি'র দিন শালগাছ দু'টিকে শালকাঠেরই তৈরী নির্দিষ্ট একটি খুঁটির ওপর হেলিয়ে রাখা হয়। যে ফ্রেমটিতে ইন্দ্‌ কাঠটি ঢোকান থাকে, সেই ফ্রেমের বিপরীত দিকে আর একটি কাঠ লাগান থাকে। এই কাঠটির মাথার দিকে থাকে তিনটি খাঁজ। এই খাঁজকাটা কাঠটি 'মাওসী খুঁটা' নামে পরিচিত।

দ্বাদশীর দিন ঘরের এবং বাইরের দুটি গাছকে নতুন কাপড় পরান হয়। 'আধাগাছ' এবং পূজা দুই-ই প্রথমে হয় বাড়ীতে। পূজার পর বাড়ীর গাছটিকে পাঁচজন মিলে প্রদক্ষিণ করার রীতি প্রচলিত। প্রদক্ষিণকারী পাঁচ জনের মধ্যে থাকেন—রাজা, রাণী, পুরোহিত এবং রাজবংশেরই অপর দু'জন ব্যক্তি। প্রদক্ষিণের পর তোলা হয় ইন্দ্‌। ঘোড়া অথবা পাল্কীতে চড়েই রাজা-রাণী গাছটিকে প্রদক্ষিণ করেন প্রথমে। পূজার পর রাজা-রাণী সহ উপস্থিত বিরাট জনতা গাছটিকে টেনে সোজা করে দেয়। এই অবস্থায় দু'টি গাছই নয়দিন পর্যন্ত রাখা থাকে। নয়দিন পরে বিসর্জানুষ্ঠান। বিসর্জনের সময় গাছ দু'টিকে স্থানীয় একটি পুকুরে ফেলে দেওয়া হয়। বাইরে স্থাপিত গাছটির গায়ে জড়ান নতুন কাপড়, ঘিরারা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়ে

নেয়। প্রচলিত সংস্কার অনুযায়ী এই কাপড়ের অংশ সঙ্গে থাকলে, সকল প্রকার কাজে ঘটে সহজ সাফল্য। পুজোর পর যে কয়দিন ইন্দ্ গাছ দু'টি থাকে, সেই ক'দিন পূজানুষ্ঠানকারী ব্যক্তির বাড়ীর কোন জিনিস বাইরে দেওয়া হয় না। এই ক'দিন ধানসিদ্ধ কিংবা লাঙ্গলজোড়া প্রভৃতি প্রাত্যহিক ক্রিয়া-কর্মাদিও বন্ধ থাকে।

পূজা শেষে রাজা এবং রাণী সুসজ্জিত স্থানে আসন গ্রহণ করেন। সর্বপ্রথম পুরোহিত তাঁদের আশীর্বাদ করেন। এরপর প্রজাবর্গ এবং বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিগণ একে একে এসে রাজা-রাণীকে প্রণাম অথবা আশীর্বাদ করেন। সেইসঙ্গে তাঁরা রাজা-রাণীকে নানাবিধ উপঢৌকন দিয়ে যান। পূর্বে যখন ভূস্বামী বা জমিদারদের আর্থিক স্বাচ্ছল্য ছিল, তখন ইন্দ্পুজোর দিন সকল প্রজাই তাঁদের বাড়ী নিমন্ত্রিত হতেন।

এই ইন্দপুজো ধনসম্পদ রক্ষা এবং বৃদ্ধির উদ্দেশ্যেই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। পুজোর দিন বৃষ্টি হলে বলা হয় মাসী কাঁদছে। লক্ষণীয় পুরুলিয়া জেলায় ইন্দপুজো উপলক্ষে নৃত্য অথবা গীত হয় না।

কিন্তু মেদিনীপুর জেলার কোন কোন অংশে ইন্দপুজো উপলক্ষে পুজোর অপরিহার্য অঙ্গ রূপে নৃত্য-গীতাদির আয়োজন হতে দেখা যায়। এখানে ইন্দপুজো উপলক্ষ্যে মাত্র একটি শাল গাছকে তুলে এনে গৃহের আঙ্গিনায় স্থাপন করা হয়। পুরুলিয়ায় যেমন একাদশীর দিন 'আধাগাছে'র রীতি প্রচলিত, মেদিনীপুরে কিন্তু তোলা গাছটিকে আঙ্গিনায় রাখা হলে তাকেই 'আদাগাছ' বা 'আধাগাছ' বলা হয়ে থাকে। এরপর গাছটিকে শালু কাপড় এবং ফুলের দ্বারা সজ্জিত করা হয়। এরপরই শুরু হয় গাছটিকে ঘিরে পল্লীবাসী মেয়ে এবং শিশুদের গীতসহকারে নৃত্য। এই নৃত্যানুষ্ঠানের উদ্দেশ্য বৃষ্টি লাভ। স্থানীয় বিশ্বাস অনুযায়ী এরূপ নৃত্যগীতে আকৃষ্ট হয়ে ইন্দ্র নেমে আসেন পৃথিবীর বুকে। আর তারই ফলে শুরু হয় অবিরাম বর্ষণ। আরও উল্লেখযোগ্য, শাল গাছটির ওপরে রক্ষিত কাঠটি যে দিকে হেলে পড়ে, প্রচলিত সংস্কার অনুযায়ী সেই দিকেই নাকি বিশেষ করে ইন্দ্রের করুণা বর্ষিত হয়। অর্থাৎ সেইখানেই বৃষ্টিপাতের প্রাচুর্য ঘটে।

অন্য ভূমিকায় ঃ জীবজন্তু ও অন্যান্য প্রাণী

পৃথিবীতে অসংখ্য জীব-জন্তুর মধ্যে বিশেষ কয়েকটি প্রাণীকেই সংস্কারের জগতে আধিপত্য বিস্তার করতে দেখা গেছে। মানুষকে যদিও ভগবানের সৃষ্ট শ্রেষ্ঠ জীব বলে বলা হয়, তবু তার ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছাবার ব্যাপারে যে এক চরম অনিশ্চয়তা রয়ে গেছে, তার থেকেই সৃষ্ট হয়েছে অসংখ্য সংস্কার ; আর এই সব সংস্কারের অনেকগুলির সঙ্গেই যোগ রয়েছে বেশ কিছু প্রাণীর। আসলে মানুষ এইসব প্রাণীদের মাধ্যমে ভবিষ্যতের শুভাশুভ ইঙ্গিত প্রত্যক্ষ করার চেষ্টা করেছে। লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, যেসব প্রাণী আমাদের চারপাশের মধ্যেই অবস্থান করে, যেগুলির সঙ্গে আমাদের প্রতিদিন সাক্ষাৎকার ঘটে, সেইসব প্রাণীদের নিয়েই সৃষ্ট হয়েছে সংস্কার। অপরপক্ষে যে সব প্রাণী মোটামুটি আমাদের নাগালের বাইরে, যেগুলি সহজলভ্য নয়, স্বাভাবিক কারণেই সেই সব প্রাণীদের আর সংস্কারের জগতে স্থান লাভ ঘটেনি। এই কারণে বেড়াল, কুকুর, গরু, ভেড়া, কিংবা ইঁদুর, বাদুড়, ব্যাঙ, টিকটিকি, মৌমাছি, প্রজাপতির মত প্রাণীদের অবাধ রাজত্ব যেখানে, সেখানে বাঘ, ভাল্লুক, সিংহ, হরিণের মত প্রাণীরা সংস্কারের জগতের বাইরে থেকে গেছে।

আমাদের সমাজে প্রজাপতির সঙ্গে শুভ বিবাহের যোগ কল্পনা করা হয়েছে। অনূঢ়া কন্যা কিংবা অবিবাহিত কোন পুরুষের গায়ে যদি প্রজাপতি এসে বসে অথবা প্রজাপতি এদের

নিকটবর্তী স্থানে উড়ে বেড়ায়, তখন কল্পনা করা হয় অবিবাহিত ছেলে অথবা অবিবাহিতা কন্যার শীঘ্র বিবাহ অনুষ্ঠিত হবে। এমনকি বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্রেও প্রজাপতির প্রতিরূপ মুদ্রিত করার রেওয়াজ আজও রয়ে গেছে। কিন্তু পৃথিবীর অন্যান্য দেশে প্রজাপতিকে আমাদের মত করে দেখা হয় নি। বহু প্রাচীনকাল থেকেই প্রজাপতিকে মৃত ব্যক্তির আত্মা বলে কল্পনা করা হয়ে এসেছে। আর এই কারণে প্রজাপতিকে সহানুভূতির সঙ্গে দেখার একটা রীতি রয়ে গেছে—কারণ কে বলতে পারে আমাদের কোন প্রিয় মৃত জনের আত্মা সে নয়!

প্রাচীনকালে মিশরে বিশ্বাস করা হ'ত যেমন করে গুটিপোকা ছেড়ে প্রজাপতি বেরিয়ে আসে, তেমনি কোন ব্যক্তির মৃত্যুকালে তার দেহ ত্যাগ করে বেরিয়ে আসে তার আত্মা। বর্মায় সংস্কার প্রচলিত আছে কোন প্রাণী যখন নিদ্রা যায়, তখন 'win-laik Pya' বা আত্মারূপ প্রজাপতি তার দেহ থেকে বেরিয়ে পড়ে এবং অন্যান্য মানুষ বা প্রাণীদের আত্মাদের সঙ্গে গিয়ে মিলিত হয়। আবার আত্মারূপ প্রজাপতির মালিক যখন জেগে ওঠে, তখন 'win-laik Pya' আবার তার যথাস্থানে ফিরে আসে। এইজন্যে বর্মায় ছেলেমেয়েদের শেখানো হয় যাতে তারা নিদ্রিত কোন ব্যক্তিকে আচমকা না ডাকে। কারণ সেক্ষেত্রে নিদ্রিত ব্যক্তির দেহ রূপ খোলস ত্যাগ করে যে 'win-laik Pya' বেরিয়ে গিয়েছিল, সে যথাসময়ে তার খোলসে নাও প্রত্যাবর্তন করতে পারে। সে ক্ষেত্রে নিদ্রিত ব্যক্তিটির মৃত্যু সুনিশ্চিত।

স্কটল্যাণ্ডে বিশ্বাস করা হয় যদি সোনালী রঙের কোন প্রজাপতি কোন মৃত ব্যক্তির কাছে উড়তে থাকে, তাহলে মৃত ব্যক্তিটির কল্যাণ সাধিত হয়। অবশ্যই মৃতের ভবিষ্যৎ কল্যাণের কথাই এইখানে ধরা হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে আয়ার্ল্যাণ্ডেও প্রচলিত আছে মৃত ব্যক্তির শবের কাছে যদি কোন প্রজাপতি উড়তে দেখা যায়, তবে বুঝতে হবে মৃত ব্যক্তির অক্ষয় শান্তিলাভ ঘটবে। যে কোনও সময়ে গাছের পাতার ওপর একসঙ্গে তিনটি প্রজাপতি দেখা অশুভ। যদিও সাধারণভাবে মৃত ব্যক্তির আত্মা বলে প্রজাপতি মারা বা এই প্রাণীটির ওপর নির্যাতন চালান নিষিদ্ধ, কিন্তু ইংলণ্ডের নানা স্থানেই যে সংস্কারটি

প্রচলিত আছে তা হ'ল—বছরের শুরুতেই প্রথম যে প্রজাপতিটি দৃষ্টি পথে পড়ে তাকে হত্যা করতে হয়। নতুবা পরবর্তী সারাটা বছরই ঐ প্রত্যক্ষদর্শীর সময় খুব খারাপ যায়। এরকম সংস্কারও চলিত আছে যে বছরের প্রথমেই যদি কেউ হলদে রঙের প্রজাপতি দেখে, তাহলে বুঝতে হবে সেই ব্যক্তি শীঘ্রই অসুস্থ হবে। অপর পক্ষে কেউ যদি সাদা রঙের প্রজাপতি দেখে তাহলে তা শুভ লক্ষণের ইঙ্গিতবহ বলে গণ্য করা হয়।

আমাদের সমাজে বাদুড় নিয়ে তেমন কোন সংস্কার রচিত না হলেও বিদেশে এই প্রাণীটির বেশ একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান সংস্কারের রাজ্যে। Oxford shire—এ প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী বাদুড় যদি কোন গৃহকে তিন বার চক্রাকারে অতিক্রম করে, তাহলে বুঝতে হবে সেই গৃহে কারো মৃত্যু আসন্ন। সন্ধ্যার ঠিক মুখেই যদি বাদুড়ের দল বেরিয়ে উড়তে থাকে এবং খেলায় মত্ত হয়, তাহলে বুঝতে হবে রমণীয় আবহাওয়ার আত্মপ্রকাশ ঘটবে। কারো মাথায় যদি হঠাৎ করে বাদুড় পড়ে যায়, তাহলে Manx-এর অধিবাসীরা বিশ্বাস করে যে সেই ব্যক্তি বিরল সৌভাগ্য লাভের অধিকারী হয়। আবার 'wilkiems' এ সংগৃহীত বিবরণ অনুযায়ী দেখা যায় স্কটল্যাণ্ডের মানুষেরা যখন দেখে কোন বাদুড় ওপরে উড়ে হঠাৎ করে নীচেয় নেমে আসে তখন তারা ধরে নেয় যে ডাইনীদের আত্মপ্রকাশের মুহূর্ত উপস্থিত। কেবল যারা ডাইনীদের হাত থেকে রক্ষা পেতে বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে তারাই এইসময় রেহাই পেয়ে যায়, নতুবা এই সময়ে ডাইনীদের হাত থেকে কারো রেহাই পাওয়ার কোন উপায় থাকে না। একটি বাদুড় দর্শনে অনেক সময় দুর্ভাগ্যের সূচনা আশঙ্কা করা হয় আর দুর্ভাগ্যের হাত থেকে রক্ষা পেতে তাই ছড়া কেটে বলতে শোনা যায়—

Black bat bear away,
Fly over here away,
And come again another day,
Black bat bear away.

পৃথিবীর প্রায় সব দেশের সংস্কারেই কাক ঠিক তার জায়গা করে নিয়েছে।

আমাদের দেশে যাত্রা সম্পর্কিত সংস্কারে বলা হয়েছে যাত্রাকালে শুষ্ক ডালে যদি কোন কাককে বসে থাকতে দেখা যায় তবে তা অশুভ। তাছাড়া কাকেরা নিজেদের মধ্যে খাদ্য নিয়ে কাড়াকাড়ি করছে যদি দেখা যায়, তাহলে বুঝতে হবে অতিথির আবির্ভাব ঘটবে। বাড়ীর সংলগ্ন কোন অংশে দুটি কাককে যদি নিজেদের মধ্যে খাবার খেতে দেখা যায়, তাহলে সেক্ষেত্রেও বাড়ীতে অতিথির সমাগম ঘটবে বলে সংস্কার। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে কাককে মূলতঃ দুর্ভাগ্য ও মৃত্যুর সঙ্গে যুক্ত করে দেখা হয়ে থাকে। যাদুকরী বিদ্যায় কাকের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা স্বীকৃত। বিশ্বাস করা হয়ে থাকে যে কাক ভবিষ্যৎ ঘটনার আভাস দানে সিদ্ধ। সাধারণভাবে একটি কাক দেখা অশুভ বলে গণ্য করা হয়। বিশেষতঃ কেউ যদি সকালে বাঁ দিকে কোন কাককে ডাকতে শোনে, তাহলে তার পক্ষে তা খুবই অশুভ বলে মনে করা হয়। একটি কাক যদি কোন বাড়ীর ছাদের ওপর দিয়ে তিন-তিনবার উড়ে যায় অথবা ছাদের আলসেয় গিয়ে বসে, অথবা বাড়ীর জানলার কাছে বসে পক্ষ সঞ্চালন করে, তাহলে সেক্ষেত্রে বুঝতে হবে যে ঐ বাড়ীর কারোর মৃত্যু আসন্ন। কাক যদি কোন বাড়ীর কাছে তিনবার ডাকে, অথবা বাড়ীর ওপর দিয়ে এক সঙ্গে যদি চার-চারটি কাক উড়ে যায়, তাহলে সেক্ষেত্রে দুঃখ আসছে বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। কারো মাথার ওপর দিয়ে যদি কাক উড়ে যায় তবে ঐ ব্যক্তির মৃত্যুর সম্ভাবনা থাকে। একটি গাছে বসে থাকা সমস্ত কাক হঠাৎ যদি ঐ গাছ ত্যাগ করে চলে যায়, তাহলে দুর্ভিক্ষ বা এই ধরণের কোন বড় বিপদ আসছে বলে ধরে নেওয়া হয়। কাকের সঙ্গে আবহাওয়ারও একটা সম্পর্ক আছে বলে অনেক জায়গায় মনে করা হয়। যেমন সকালে যদি কাকদের সূর্যের দিকে উড়তে দেখা যায়, সেক্ষেত্রে আবহাওয়া ভাল যাবে বলে ধরে নেওয়া যায়। কাকের সংখ্যার সঙ্গেও ভাল-মন্দ জড়িত। যেমন আমেরিকার Mary land-এ প্রচলিত ছড়ায় বলা হয়েছে একটি কাক দেখা মানেই দুঃখ ভোগ, দু'টি কাক দর্শনে সেক্ষেত্রে লাভ হয় আনন্দ, তিনটি কাক দেখলে হয় বিবাহ আর চারটি দেখার অর্থ কারো জন্মগ্রহণ—

One crow—sorrow,

Two crows—mirth,
Three crows—wedding,
Four crows—birth

কাকের মত পেঁচারও একটা বিশেষ ভূমিকা লক্ষ্য করা যায় সংস্কারের ক্ষেত্রে। আমাদের সমাজে কালপেঁচা ডাকলে অর্থহানি ঘটে বলে বিশ্বাস। অপরপক্ষে রাত্রে সাদা পেঁচা বা লক্ষ্মীপেঁচা দেখা শুভ, সেক্ষেত্রে অর্থলাভ ঘটে। আবার দিনেরবেলায় বাড়ীর চালে পেঁচা বসা অশুভ বলে বলা হয়ে থাকে। এইবার বিদেশে প্রচলিত সংস্কারে পেঁচা বা পেঁচার ডাককে কিভাবে দেখা হয় তার পরিচয় নেওয়া যেতে পারে। ফ্রান্সে কোন সন্তান সম্ভবা নারী যদি পেঁচার ডাক শোনে, তাহলে সেই নারীর কন্যা সন্তান হয় বলে বিশ্বাস। ওয়েল্‌স-এ বসত বাড়ীর মাঝখানে যদি পেঁচার ডাক শুনতে পাওয়া যায়, তাহলে ধরে নেওয়া হয় কোন কুমারী মেয়ের কুমারীত্ব নষ্ট হল। জার্মানীতে কোন গর্ভবতী রমণী যদি পেঁচার ডাক শোনে, তাহলে ঐ রমণী যে সন্তান প্রসব করে তার জীবন হয় খুব অসুখী।

প্রাচীনকালে মৌমাছিদের স্বর্গীয় দূত বা বার্তাবহ বলে মনে করা হত। শুধু তাই নয় এরা ভবিষ্যৎ-বাণী করাতেও দক্ষ এরকম ধারণাও প্রচলিত ছিল। বিশেষত খ্রীষ্টান ঐতিহ্যে মৌমাছিদের ত ক্ষুদ্র পাখা বিশিষ্ট ভগবানের ভৃত্য বলে গণ্য করা হয়। হঠাৎ করে যদি বাড়ীতে কোন মৌমাছি এসে উপস্থিত হয়, তাহলে তা সৌভাগ্যের সূচক বলে মনে করা হয় অথবা ধরা হয় বাড়ীতে অনতিবিলম্বে কোন অভ্যাগতের আবির্ভাব ঘটবে। বাড়ীতে মৌমাছি এসে প্রবেশ করলে কখনও তাকে তাড়িয়ে দিতে নেই বা ধরতে নেই। অর্থাৎ মৌমাছিকে তার ইচ্ছামত বাড়ীতে থাকতে দিতে হয় অথবা তার ইচ্ছানুযায়ী তাকে উড়ে যেতে দিতে হয়, কোন বাধার সৃষ্টি করতে নেই। কারণ যদি মৌমাছিকে ধরা হয় অথবা তাড়িয়ে দেওয়া হয় তাহলে সৌভাগ্য সুখ বিনষ্ট হয় বলে বিশ্বাস। ওয়েল্‌স-এ বিশ্বাস করা হয় যে কোন ঘুমন্ত শিশুর চারপাশে যদি কোন মৌমাছি উড়ে বেড়ায় তাহলে বুঝতে হবে যে ঐ শিশুটি সৌভাগ্য সুখ লাভের অধিকারী হবে।

ইংলণ্ডের কোন কোন অঞ্চলে এমন ধারণা প্রচলিত আছে যে মৌমাছিরা যদি অলস হয়ে যায়, মধু সংগ্রহ করা থেকে বিরত থাকে তাহলে বুঝতে হবে শীঘ্রই যুদ্ধ বাধবে। কোন বাড়ীর ছাদে যদি মৌমাছি মৌচাক তৈরী করে, তাহলে ঐ বাড়ীর মেয়েরা অবিবাহিত থাকে, তারা আর বিবাহ করে না। মৌমাছি এবং মৌচাক সম্বন্ধে আরও একটি সংস্কার প্রচলিত আছে। সেটি হ'ল যে বাড়ীতে মৌচাক তৈরী হয়, সেই বাড়ীর মালিকের সঙ্গে মৌচাকের মৌমাছিদের গভীর একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠে। আর এর থেকেই রীতি গড়ে ওঠে যে বাড়ীর সব গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ মৌমাছিদের জানানো কর্তব্য। বাড়ীতে যদি কোন শিশু জন্মগ্রহণ করে অথবা কারো বিবাহ হয়, কোন ব্যাপারে কারো সাফল্যলাভ অথবা দুঃখ ভোগ কিংবা কারো মৃত্যুর ঘটনা—এ সবই, বিশেষত গৃহকর্তার মৃত্যু সংবাদ অবশ্যই মৌমাছিদের জানাতে হয়। গৃহকর্তার মৃত্যু সংবাদ জানানোরও একটা বিশেষ রীতি আছে। সেটি হ'ল—গৃহকর্তার মৃত্যু হলে গৃহস্বামীর জ্যেষ্ঠপুত্র অথবা তাঁর বিধবা পত্নীকে দরজার লৌহনির্মিত চাবি দিয়ে মৌচাকে তিনবার আঘাত করে বলতে হয়, কর্তার মৃত্যু হয়েছে। এরকমটা করা না হলে মৌচাকের মৌমাছিরা মারা পড়ে অথবা তারা মৌচাক ছেড়ে পালিয়ে যায় আর এর ফলে বাড়ীতে নতুন বিপদ দেখা দেয়। লোক-বিশ্বাস এবং সংস্কারে মৃত্যুর সঙ্গে মৌমাছিদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে। প্রাচীনকালে এমন ধারণাও ছিল যে মৃত্যুর অব্যবহিত পরে মৃত ব্যক্তির আত্মা কিছু সময়ের জন্যে মৌমাছি হয়ে যায়। কোন কারণ ছাড়াই যদি মৌমাছিরা মৌচাক ছেড়ে চলে যায়, তাহলে যে বাড়ীতে মৌচাকটি, অবস্থিত সেই বাড়ীতে কারো মৃত্যু ঘটার সম্ভাবনা, আর এক্ষেত্রে বিশেষ করে গৃহস্বামীর মৃত্যুর সম্ভাবনাই প্রবল হয়ে ওঠে।

টিকটিকি নিয়েও বেশ কিছু সংস্কার রচিত হয়েছে। যেমন আমাদের সমাজে প্রচলিত রয়েছে কারো বাঁ দিকে টিকটিকি পড়লে সে রাজা হয়। আবার এমন সংস্কারও প্রচলিত আছে—কারো বামে টিকটিকি ডাকলে তার কাজে নাকি বাধা পড়ে। একটি প্রবাদে ত এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

হাঁচি জেঠি পড়ে যবে, অষ্টগুণ লভ্য হবে।

অর্থাৎ যাত্রাকালে হাঁচি বা গায়ে যদি টিকটিকি পড়ে তাহলে আটগুণ লাভ হয়। এইবার পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সংস্কারে টিকটিকিকে কিভাবে দেখা হয়েছে তার পরিচয় নেওয়া যেতে পারে। পাশ্চাত্ত্য দেশগুলিতে বিশেষতঃ ইংলণ্ডে কনের পক্ষে টিকটিকি খুবই এক অশুভ প্রাণী। ইউরোপের অনেক দেশে এই সংস্কার প্রচলিত যে কন্যাপক্ষেরা বিবাহ উপলক্ষে চার্চে যাবার সময় তাদের যাত্রাপথ যদি কোন টিকটিকি অতিক্রম করে যায়, তাহলে কন্যার বিবাহ সুখের হয় না। ফ্রান্সে প্রচলিত আছে, টিকটিকি যদি কোন স্ত্রীলোকের হাতের ওপর দিয়ে চলে যায়, তাহলে ঐ স্ত্রীলোকটির হাতের সেলাই খুব ভাল হয়। আয়ার্ল্যাণ্ডে আবার এমন এক সংস্কার প্রচলিত আছে যে, কোন ব্যক্তি যদি একটি টিকটিকিকে চাটতে পারে তাহলে সেই ব্যক্তির জিভ বিশেষ এক শক্তির অধিকারী হয়ে যায়, ফলে ঐ ব্যক্তি যদি কারোর কোন ক্ষত তার জিভ দিয়ে চেটে দেয়, তাহলে ক্ষতস্থান নিরাময় হয়ে ওঠে। টিকটিকি সম্পর্কে আরও একটি অভিনব ধারণা প্রাচীনকালে প্রচলিত ছিল। বিশ্বাস করা হ'ত গৃহের বাইরে শয়নকারী কোন ব্যক্তিকে যদি সাপ কামড়াতে আসত, তখন টিকটিকি ঐ ঘুমন্ত ব্যক্তিকে জাগিয়ে দিয়ে তার প্রাণ রক্ষা করত সর্পাঘাত জনিত মৃত্যুর হাত থেকে।

সংস্কারের রাজ্যে ব্যাঙও তার স্থান করে নিয়েছে। আমাদের সমাজে বলা হয় ব্যাঙ মেরে চিৎ করে রাখলে বৃষ্টি হয়। আবার অতিবৃষ্টি থামাতে দুটো ব্যাঙ ধরে তাদের সিঁদুর, হলুদ আর তেল মাখিয়ে বিয়ে দিতে হয়। যেহেতু জলের জীব ব্যাঙ তাই বৃষ্টি নামানো অথবা বন্ধের ব্যাপারে এই প্রাণীর এক বিশেষ ভূমিকাকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। অন্যান্য দেশেও বৃষ্টির সঙ্গে ব্যাঙকে যুক্ত করে দেখা হয়ে থাকে। যেমন দিনের বেলা যদি ব্যাঙ ডাকে তাহলে বৃষ্টি নামে। একরমও ধারণা প্রচলিত আছে যে একটি ব্যাঙকে হত্যা করলে বৃষ্টি নামে। নিদেন পক্ষে ঝড় ওঠে। ব্যাঙ দেখা খুব সৌভাগ্যের ব্যাপার—এমন সংস্কারও রয়েছে। শুধু তাই নয় কোন ব্যাঙ যদি স্বেচ্ছায় কারো বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করে তাহলে সেই বাড়ীর

পক্ষে খুব শুভ ব্যাপার কিছু ঘটবে বলে বিশ্বাস করা হয়। অল্প বয়সের ব্যাঙ গুরুতর পীড়া নিরাময়ে সমর্থ এমন কি এই ধরণের ব্যাঙ প্রেম-প্রীতির সম্পর্ক উন্নত করে বলে বিশ্বাস।

ইঁদুর সংক্রান্ত সংস্কারগুলিতে মূলতঃ দুর্ভাগ্য ও মৃত্যুর সঙ্গে ইঁদুরের সম্পর্কের কথাই বলা হয়েছে। যেমন কোন বাড়ীতে, আগে যেখানে ইঁদুরের উপদ্রব ছিল না সেখানে যদি প্রচুর ইঁদুরের আবির্ভাব ঘটে কিংবা বিপরীত ক্রমে যে বাড়ী ছিল ইঁদুর অধ্যুষিত অথচ বিনা চেষ্টাতেই সেই বাড়ী থেকে ইঁদুর যদি উধাও হয়ে যায়, তাহলে বুঝতে হবে ঐ বাড়ীর কোন ব্যক্তির মৃত্যু নিকটবর্তী। কোন অসুস্থ ব্যক্তির শয্যার পেছন থেকে যদি ইঁদুর ডাকে তাহলে অসুস্থ ব্যক্তির আর নিরাময় লাভ ঘটেনা। সুস্থ অথবা অসুস্থ যেমনই হোক কোন ব্যক্তির ওপর দিয়ে যদি ইঁদুর চলে যায়, শীঘ্রই ঐ হতভাগ্য ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে বলে বিশ্বাস। কোন সাদা রঙের ইঁদুর যদি ঘরের মেঝে অতিক্রম করে চলে যায়, তাহলে তা মৃত্যুর সম্ভাবনাকে বহন করে আনে। প্রাচীনকালে ইঁদুরের সঙ্গে আত্মার সম্পর্ক আছে বলে বিশ্বাস করা হত। এমন কি আত্মার দৃষ্টি গ্রাহ্য রূপ হ'ল ইঁদুর—এমন ধারণা প্রচলিত ছিল। সম্ভবতঃ সেই ধারণা থেকেই ইঁদুরের সঙ্গে মৃত্যুর সম্পর্ক কল্পিত হয়েছে।

আমাদের দেশে ভেড়া নিয়ে কোন সংস্কার সৃষ্ট না হলেও পাশ্চাত্য দেশে এই প্রাণীটিকে নিয়ে সংস্কার গড়ে উঠেছে লক্ষ্য করা যায়। বিশ্বাস করা হয় বসন্তকালে যদি ভেড়া দেখা যায় তবে এই সময়ে প্রথম দৃষ্ট ভেড়াটি সৌভাগ্য-সুখ এনে দেয়। অবশ্য শুধু দেখলেই চলবেনা, যে ভেড়া দেখবে অর্থাৎ প্রত্যক্ষদর্শী যে, তার দিকেই ভেড়াটিকে মাথা ঘোরাতে হবে। যদি ভেড়ার মাথা অন্যদিকে ঘোরান থাকে তাহলে তা সৌভাগ্যের পরিবর্তে দুর্ভাগ্যসূচক হয়ে দাঁড়ায়। সাধারণত কৃষ্ণ বর্ণের প্রাণীদের সংস্কারের জগতে খারাপ দৃষ্টিতে দেখা হয়ে থাকে কিন্তু ভেড়ার ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম লক্ষণীয়। অর্থাৎ প্রথম দৃষ্ট ভেড়াটি কৃষ্ণবর্ণের হলে প্রত্যক্ষদর্শীর ভাগ্য ভাল বুঝতে হবে। শুধু তাই নয়, এই রকম ভেড়াকে দেখে যদি মনে মনে কিছুর বাসনা করা হয়, তবে তাও নাকি ফলবতী হয়।

সংস্কারে যে সব প্রাণীর আধিপত্য এক কথায় রাজকীয়, বেড়াল তাদের অন্যতম। বেড়ালকে নিয়ে যে কত অজস্র সংস্কার দেশে-বিদেশে তৈরী হয়েছে তার আর ইয়ত্তা নেই। আর আমরা সহজেই এর কারণটা বুঝি। বেড়াল বা কুকুর আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত হয়ে গেছে। ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক এ দুটি প্রাণীকে আমরা প্রত্যহই দেখে থাকি ঘরে অথবা বাইরে কিংবা ঘরে বাইরে দু'জায়গাতেই। অতএব এ হেন প্রাণী যে সংস্কার জগতে সহজেই গুরুত্বপূর্ণ স্থানের অধিকারী হবে, তা বলাই বাহুল্য। এখন দেখা যাক বেড়াল নিয়ে প্রচলিত সংস্কারগুলির চরিত্র কি রকম।

পৌষমাসে বাড়ী থেকে কাউকে তাড়াতে নেই, এমন কি এই সময় বাড়ী থেকে বেড়াল—কুকুরকে তাড়ানোর ব্যাপারেও নিষেধ করা হয়েছে। আমাদের সমাজের একটি সংস্কারে রাত্রে বাড়ীতে বেড়াল এলে তাকে তাড়াতে নিষেধ করা হয়েছে। অপর একটি সংস্কারে বলা হয়েছে বেড়ালকে হত্যা করতে নেই। হত্যা করলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। প্রায়শ্চিত্তে মৃত বেড়ালের ওজনের সমান সোনা অথবা লবণ দান করতে হয়। অন্যত্র প্রচলিত আছে বেড়াল হত্যা করে প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ মৃত বেড়ালের ওজনের সমান লবণ খাল বিল কিংবা পুকুরের জলে ফেলে দিতে হয়। রাতের বেলার বেড়ালের কান্না শোনা খুবই খারাপ বলে বিশ্বাস প্রচলিত। বাড়ীতে কালো বেড়ালের আনাগোনাকেও মোটেই সুনজরে দেখা হয় না। কারণ এতে নাকি বাড়ীর কারোর মৃত্যু ঘটতে পারে। আবার ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠে সর্বপ্রথম বেড়ালের মুখ দেখাও খারাপ বলে বলা হয়ে থাকে। কারণ তাহলে সমগ্র দিনটি খারাপ যায়।

এইবার দেখা যাক পৃথিবীর অন্যান্য দেশে এই প্রাণীটিকে কিভাবে দেখা হয়ে থাকে। প্রথমেই এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করে নেওয়া যেতে পারে যে পাশ্চাত্ত্য দেশে বেড়ালকে সৌভাগ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত করে দেখা হয়ে থাকে। প্রাচীন-কালে মিশরীয়রা পুরুষ বেড়ালকে সূর্য দেবতার প্রতিনিধিস্বরূপ এবং স্ত্রী বেড়ালকে চন্দ্রের প্রতিনিধি বলে বিশ্বাস করত। আমাদের সমাজে যদিও

কালো বেড়ালকে অলুক্ষণে বলে বিশ্বাস করা হয়, কিন্তু পৃথিবীর অন্যান্য দেশে কালো বোড়ালকে সৌভাগ্যদাতা বলে বিবেচনা করা হয়ে থাকে, বিশেষতঃ যদি কোন কৃষ্ণ বর্ণের বেড়াল কারো যাত্রা পথ অতিক্রম করে যায়। এমন কি কোন কালো বেড়াল যদি নিজের থেকেই বাড়ীতে এসে প্রবেশ করে অথবা কোন জাহাজে এসে ওঠে, তাহলে সেক্ষেত্রে সেটা খুব একটা সৌভাগ্যের ব্যাপার বলে গণ্য করা হয় এবং কোন ক্ষেত্রেই এই প্রাণীটিকে তাড়িয়ে দিতে নেই, দিলে তাড়নাকারীর সৌভাগ্য সুখ এই প্রাণীটি সঙ্গে করে নিয়ে যায় বলে ধারণা। বেড়াল যদি আগুনের কাছে পেছন ফিরে বসে থাকে, তাহলে সেক্ষেত্রে ধরে নেওয়া হয়—শীঘ্রই ঝড় হবে। যাত্রা কালে যদি কোন বেড়ালকে কাঁদতে শোনা যায়, তাহলে সেক্ষেত্রে যাত্রা ব্যর্থ হবার সম্ভাবনা। এক্ষেত্রে বেড়ালের কান্না থামিয়ে তবেই যাত্রা করা বিধেয়। হঠাৎ করে যদি বেড়াল খুব তীব্র গতিতে দৌড়তে থাকে কিংবা মেঝের কার্পেটে আঁচড়াতে থাকে তাহলে ধরে নেওয়া হয় ঝড় আসছে। বেড়াল যদি একবার হাঁচে, তবে তা শুভ লক্ষণ বলে মনে করা হয়। কিন্তু যদি তিনবার হাঁচে, তাহলে যে বাড়ীতে তার অবস্থান, সেইবাড়ীর লোকেদের ঠাণ্ডা লাগে।

ইয়র্ক শায়ারের উপকূলে খনিতে নামবার সময় কর্মীরা কখনও 'cat' কথাটি উচ্চারণ করে না। জেলেনী যদি কালো বেড়াল পোষে, তাহলে তার স্বামী অর্থাৎ জেলে নির্বিঘ্নে সমুদ্র থেকে ফিরে আসে বলে বিশ্বাস। অভিনেতারা ভুলেও বেড়ালের গায়ে পদাঘাত করে না। থিয়েটারে যদি বেড়াল দেখা যায় তবে তা খুবই শুভ ঘটনা বলে মনে করা হয়। কিন্তু অভিনয় চলাকালে যদি বেড়াল মঞ্চ অতিক্রম করে চলে যায়, তবে তা খুবই অশুভ। পূর্ব ইয়র্কশায়ারে যেখানে কালো বেড়ালের অধিকারী হওয়া খুব সৌভাগ্যের ব্যাপার, সেক্ষেত্রে কালো বেড়ালের দেখা পাওয়া দুর্ভাগ্যের সূচক। আমেরিকা এবং ইউরোপে সাদা বেড়ালকে ক্ষতিকারক এবং অশুভ বলে মনে করা হয়।

পাশ্চাত্য দেশসমূহে কুকুর অশরীরী আত্মা—যেমন ভূত, প্রেত, ডাইনী,

পরী ইত্যাদিদের দেখতে পায় বলে বিশ্বাস করা হয়। অর্থাৎ মানুষ তার চর্মচক্ষুতে যা না দেখতে পায়, কুকুর তা অনায়াসে দেখতে পায়। ওয়েলস্-এ 'Annwn' এর মৃত্যু আনয়নকারী শিকারীকুকুর, কেবল পার্থিব কুকুরদেরই দৃষ্টিগোচর হয় বলে সংস্কার প্রচলিত আছে। প্রাচীনকালে গ্রীসে যখন 'Hecate' রাস্তার সংযোগস্থলে ঘোরাফেরা করছিল, তখনও কুকুরেরা তার উপস্থিতি সম্পর্কে সতর্কীকরণের জন্যে একসঙ্গে তুমুল চীৎকার করেছিল বলে বলা হয়ে থাকে। 'Hecate' মৃত্যু ঘোষণা করতেই উপস্থিত হয়েছিল। আমাদের দেশের মতন পাশ্চাত্যদেশগুলিতেও কুকুরের ডাককে অশুভ লক্ষণ বলেই বিবেচনা করা হয়। বিশেষত রাত্রে যদি কুকুর ডাকে, তাহলে তা মৃত্যুর সূচক হয়ে দাঁড়ায়। যে বাড়ীতে কেউ অসুস্থ অবস্থায় আছে, সেই বাড়ীর সামনে যদি কোন কুকুর একটানা ডেকে চলে, তাহলে বুঝতে হবে অসুস্থ রুগীটি আর বাঁচবে না। আবার কুকুর যদি হঠাৎ একবার অথবা তিনবার ডেকেই চুপ করে যায়, তাহলে বুঝতে হবে সেই মুহূর্তে কারো মৃত্যু ঘটলো। পোল্যাণ্ড এবং জার্মানীর কোন কোন অংশে এই রকম সংস্কার প্রচলিত আছে যে একসঙ্গে অনেকগুলি কুকুর যদি ডাকে, তাহলে শীঘ্রই প্লেগ বা মহামারী আত্মপ্রকাশ করে। বেদে বা যাযাবর জাতীয় লোকেরা বিশ্বাস করে যে কোন কুকুর যদি কারো বাগানে প্রবেশ করে গর্ত খোঁড়ে, তাহলে বুঝতে হবে ঐ পরিবারের কারো মৃত্যু ঘটতে চলেছে। ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে বিশ্বাস করা হয় কোন অপরিচিত কুকুর যদি কোন আগন্তুককে অনুসরণ করতে থাকে, তাহলে তা সৌভাগ্যের ইঙ্গিতবহ। আয়ার্ল্যাণ্ডে ভোরবেলায় কেউ যদি চীৎকাররত কোন কুকুরকে প্রথমে দেখে, তাহলে তা তার পক্ষে খুবই অশুভ।

ইংলণ্ডে কোন ব্যক্তি ব্যবসায়িক কোন কাজকর্মের ব্যাপারে যাত্রা করার সময় যাত্রাপথে যদি দাগ বিশিষ্ট অথবা সাদা-কালোয় মেশানো কোন কুকুরকে দেখে, তাহলে তার ব্যবসায়িক কাজকর্ম সাফল্যমণ্ডিত হয়। লিঙ্কন-শায়ারে আবার এক বিচিত্র সংস্কার প্রচলিত আছে। কোন সাদা কুকুর দেখতে পেলে যতক্ষণ না এরপর সাদা রঙের ঘোড়া চোখে পড়ছে, ততক্ষণ

নীরবতা অবলম্বন করতে হয়। তানাহলে কোন দুর্ভাগ্যজনক কিছু ঘটে যাবার সম্ভাবনা। জেলেরা সমুদ্রবক্ষে কখনও 'dog' শব্দটি উচ্চারণ করেনা এমনকি কোন কোন উপকূল অঞ্চলের মানুষ শুধু 'dog' শব্দটিই উচ্চারণ করেনা তাই নয়, নৌকা করে কখনও কোন কুকুরকে নিয়ে যায় না।

গরু নিয়ে আমাদের দেশেও যেমন বেশ কিছু সংস্কার আছে, তেমনি আছে বিদেশেও। যেমন আমাদের সমাজে গরু-বাছুর মারা গেলে কাঁদতে বারণ করা হয়েছে। কারণ এতে নাকি অমঙ্গল হয়। গরুর দুধ কি করে ভাল করা যায় সেই প্রসঙ্গে সে সংস্কারটি আছে তা হল গরুর প্রসব হলে ফুল পড়ার আগে গরুটির লেজ থেকে মাথা পর্যন্ত মেপে সাতগাছি কলমীলতা গরুকে খাইয়ে দিতে হয়। যাতে কেউ গরুর দুধ চালতে না পারে সেজন্যে ছেঁড়া জালের টুকরোতে কচ্ছপের খোলা, কড়ি, ঝাঁটার টুকরো—সব একসঙ্গে বেঁধে গরুর গলায় ঝুলিয়ে দিতে হয়। যাত্রাকালে গরুর কাশি শুনলে যাত্রা ব্যর্থ হয়ে যায়। তাছাড়া যাত্রার সময়, বাঁধা অপেক্ষা কোন ছাড়া গরু দেখতে পাওয়া শুভের ইঙ্গিত। বিশেষত সেই গরু যদি আবার মাথা তুলে তাকায়। বেরোবার সময়ে গরু হাঁচলে বেরোতে নেই, বেরোলে মৃত্যুর সম্ভাবনা থাকে। গরু চুরি করাকে আমাদের সমাজে মহা অপরাধ বলে গণ্য করা হয়। লোক-বিশ্বাস এই যে গরু চোরের মৃত্যু অনিবার্য। গরু প্রসব করার পর গরুর গলায় যদি আধখানা নারকোল মালা ফুটো করে ঝুলিয়ে দেওয়া যায় তাহলে গরু এবং তার বাছুর উভয়েরই ভাল হয়।

বিদেশেও গরুকে নিয়ে অনেক সংস্কার তৈরী হয়েছে। আমরা বিশ্বাস করি কালো গরুর দুধ ভাল। কিন্তু ইংলণ্ডে লাল গরুর দুধ অন্য সব বর্ণের গরুর দুধ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলে বলা হয়। স্কটল্যাণ্ডে আবার সাদা গরুর দুধ অন্য যে কোন রঙের গরুর দুধের তুলনায় নিকৃষ্ট বলে ধারণা প্রচলিত। মধ্য রাত্রের পর গরু ডাকলে নিকটস্থ স্থানে কারোর মৃত্যু ঘটে। কোন মানুষের মুখের ওপর যদি গরু তিনবার ডাকে সেই ব্যক্তির শীঘ্র মৃত্যু ঘটে বলে বিশ্বাস। অনেক আমেরিকানের বিশ্বাস যে লাল গরুর মাংস সর্বোৎকৃষ্ট।

বাংলা লোক-সাহিত্যে হাস্যরস

তুলনামূলক বিচারে বাঙ্গালী হাস্যরস অপেক্ষা করুণ রসের প্রতিই অধিকতর আকৃষ্ট—এমন একটা ধারণা প্রচলিত আছে। জীবনের নশ্বরতা সম্পর্কে অতি সচেতনতা, সাফল্য এবং কৃতিত্বের তুলনায় অসাফল্য, ব্যর্থতা—নৈরাশ্যের প্রতি প্রয়োজনাতিরিক্ত গুরুত্বদান, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের চরম অসাম্য সর্বোপরি এতদঞ্চলের ভৌগোলিক পরিবেশ—বাঙ্গালীর করুণ রস-রসিকতার মূল বলে অভিহিত করা যায়। তাই বলে বাঙ্গালী যে সম্পূর্ণভাবে রসিকতা বিমুখ, আনন্দ-কৌতুক রসাস্বাদনের ক্ষেত্রে চরমভাবে ব্যর্থ, এমন কথাও বলা চলে না। এ পর্যন্ত অন্ততঃ পক্ষে দু'টি বৃহৎ গ্রন্থে আমাদের লিখিত সাহিত্য অবলম্বনে হাস্য-রসের ধারা ও স্বরূপ আলোচিত হয়েছে। অপরাপর বেশ কয়েকটি গ্রন্থেও বাংলা সাহিত্যের হাস্যরসের প্রকৃতি ও পরিমাণ সম্পর্কিত আলোচনা স্থান পেয়েছে। কিন্তু আমাদের মৌখিক সাহিত্যে প্রকাশিত হাস্যরস ও তার প্রকৃতিসম্পর্কেএকটি গ্রন্থ ব্যতীত অন্যত্র তেমন কোন আলোচনা হয় নি। লিখিত সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য অংশ পাশ্চাত্য শিক্ষা, সভ্যতা ও রুচির প্রভাবে প্রভাবিত। সেখানে ব্যক্তিবিশেষের মানসিকতার পরিচয় লাভটি যেমন সুলভ, সামগ্রিক ভাবে বাঙ্গালী মানসিকতার পরিচয় লাভ তেমন সুলভ নয়। কিন্তু সেই পরিচয়টি পেতে হলে আমাদের অবশ্যই মৌখিক সাহিত্যের শরণাপন্ন হতে হয়। আমাদের প্রবাদ, ধাঁধা, ছড়ায় কৌতুক

রসের যে অফুরন্ত ভাণ্ডার আজও অনালোচিত রয়ে গেছে বর্তমান প্রবন্ধের নাতিদীর্ঘ পরিসরে তারই কিছু পরিচয় লাভের চেষ্টা করা হবে। আর সেই আলোচনায় একটা সত্য আমরা উপলব্ধি করতে পারব যে বাঙ্গালী কেবল করুণরস রসিক বিশেষণে বিশেষিত হবার যোগ্য তাই নয়, সেই সঙ্গে সে কৌতুকরস প্রিয়ও বটে।

আমরা জানি হাস্যরস সৃষ্টি করতে গেলে একদিকে যেমন প্রয়োজন হয় বিরল ক্ষমতার, অপরদিকে তেমনি প্রয়োজন হয় সুগঠিত মানসিক স্বাস্থ্যের। মানসিক দিক দিয়ে দুর্বল যে, তার পক্ষে রসোত্তীর্ণ এবং স্বতঃস্ফূর্ত হাস্যরস সৃষ্টি কোন মতেই সম্ভবপর নয়। অর্থাৎ এককথায় বলতে গেলে হাসি হ'ল সজীব মানসিকতার পরিচায়ক। বাঙ্গালীর মানসিক স্বাস্থ্য আজ না হলেও একদিন যে অটুট ছিল, তারই সাক্ষ্য বহন করে বাংলা লোক-সাহিত্যের হাস্য-রসাত্মক প্রবাদ, ধাঁধা, ছড়াগুলি। আজকের দিনের তথাকথিত ভদ্ররুচির তুলনায় আমাদের লোক-সাহিত্যের হাস্যরস হয়ত কিছুটা অমার্জিত রুচির পরিচয়বাহী বলে প্রতিভাত হবে। কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে যে যুগে এইসব উপাদানের সৃষ্টি, সে যুগ ছিল শুচিবায়ুগ্রস্ততা থেকে মুক্ত। তাছাড়া হাস্য-রস সৃষ্টির ক্ষেত্রে আমরা (প্রবাদ, ধাঁধা ইত্যাদিতে) যে ভাষার অসংযম রূপ লক্ষ্য করি, বিস্মৃত হলে চলবেনা তা প্রকারান্তরে ভাবের প্রাবল্যকেই সূচিত করেছে। ডঃ সুশীল কুমার দে'র ভাষায়,'জোরালো ও রসালো ভাষার জন্ম হইতেছে জাতির অতি-জাগ্রত বাস্তব অনুভূতির স্বাভাবিক রস প্রেরণায়।··আধুনিক মাপকাঠিতে অশিষ্ট ও অমার্জ্জিত হইলেও, ইহা প্রত্যক্ষ অনুভূতির ফল এবং ভাষার প্রকৃতিগত সহজ সামর্থ্যে স্বচ্ছ ও স্বচ্ছন্দ।' এইবার তাহলে বাঙ্গালীর চোখের জলের সঙ্গে মুখের হাসিটির প্রতিও কিরূপ আন্তরিক আকর্ষণ—তার পরিচয় গ্রহণ করা যেতে পারে। আর সে পরিচয় গ্রহণে প্রথমে প্রবাদকেই অবলম্বন করা গেল।

ক. বাংলা প্রবাদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য হ'ল এগুলি অতি মাত্রায় **cynical**। কিন্তু না, তাই বলে এই নির্মম এবং কঠোর ভাষণের মূলে মনুষ্য-বিদ্বেষ কাজ করে নি, বরং বলা চলে একদিকে বাস্তব পরায়ণতা অপরদিকে মনুষ্য বিদ্রূপই

হ'ল এর মুখ্য অবলম্বন। তবে হ্যাঁ অতিমাত্রায় বাস্তবপরায়ণতার ফলে প্রবাদের পরিহাস ও ব্যঙ্গ ক্ষেত্রবিশেষে রূঢ় বলে প্রতিভাত হ'তে পারে। আসলে, 'অতিজাগ্রত বাস্তব চেতনা হইতে, প্রতিদিনের সঙ্কীর্ণ জীবনের তুচ্ছতা ও ক্ষুদ্রতার সংস্পর্শ হইতে যে তীক্ষ্ণ সাংসারিক জ্ঞান, তাহাই ইহার তীব্র রসিকতায় উৎসারিত

শ্বশুরবাড়ী এবং জামাইকে নিয়ে অনেকগুলি প্রবাদ সৃষ্ট হয়েছে। একটি প্রবাদে বলা হয়েছে :

শ্বশুর বাড়ী মধুর হাঁড়ি, তিন দিন পরে ঝাঁটার বাড়ি ॥

অর্থাৎ অল্প সময়ের জন্যে আদর-আপ্যায়ণ লাভের আদর্শ ক্ষেত্র হলেও জামাইয়ের পক্ষে শ্বশুর বাড়ীতে দীর্ঘ সময়ের জন্যে অবস্থান মোটেই উচিত নয়, কারণ পরিণামে তাতে জামাইয়ের যে অভিজ্ঞতা হবে, তাকে কোনমতেই সুখকর বা বাঞ্ছিত বলা যাবে না। জামাই মূলতঃ ভাল-মন্দ খাবার আর আদর-আপ্যায়ণের আশাতেই শ্বশুরালয়ে গিয়ে উপস্থিত হয়। কিন্তু জামাইয়ের আবার একদিকে খাবার লোভ, অপরদিকে থাকে প্রখর আত্ম-মর্যাদাবোধ। লোকদেখানো ভাল মানুষ সাজতে গিয়ে শ্বশুর বাড়ীর অনুরোধ অগ্রাহ্য করে উপাদেয় খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ না করার পরে তার অবস্থা কি হয়, তারই সুন্দর পরিচয় উপস্থাপিত হয়েছে একটি প্রবাদে—

যাচলে জামাই খান না পিঠে, শেষে মরেন ঢেঁকশাল চেটে ॥

ঘরজামাই নিয়ে অসংখ্য প্রবাদ রচিত হয়েছে এবং সব ক'টি প্রবাদেই এই বিচিত্র চরিত্রের মানুষগুলিকে বেশ একহাত নিয়ে নেওয়া হয়েছে। একটি প্রবাদে ঘরজামাই এবং বাইরের জামাইয়ের পার্থক্য দেখিয়ে বলা হয়েছে—

বাইরের জামাই মধুসূদন, ঘরের জামাই মেধো।
ভাত খাওসে মধুসূদন, ঘরের জামাই মেধো ॥

এই প্রবাদটিতে ঘরজামাই সম্পর্কে যেটুকু শালীনতা রক্ষিত হয়েছে (যদি অবশ্য হয়ে থাকে) ঘরজামাই সম্পর্কিত অন্য দুটি প্রবাদে সেটুকুও আর রক্ষিত হয় নি। বলা হয়েছে—

দূর জামাইয়ের কাঁধে ছাতি, ঘরজামাইয়ের মুখে লাথি ॥

ঘরজামাইয়ের ক্ষেত্রে লভ্য শ্বশুরবাড়ীর তথাকথিত সুখ, ব্যজস্তুতির মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে একটি প্রবাদে—

শ্বশুরবাড়ী সুখ বড়, ঘরজামাই কিলে দড় ॥

কথায় বলে 'বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা।' কিন্তু তরুণী ভার্যা লাভের ফলে বৃদ্ধের অবস্থা যে খুব ভাল হয় তা নয়, বরং বলা চলে তার অবস্থা হয় শোচনীয়। কিন্তু না, প্রবাদে এই ধরণের তরুণী ভার্যার বৃদ্ধ স্বামীদের প্রতি বিন্দুমাত্র সহানুভূতি দেখান হয় নি। বলা হয়েছে—

বুড়ো বয়সে নবীন নারী, জ্বর বিকারে বিলের বারি।
আধমরা হয় নয়ন বাণে, দেখতে পায় না চোখে কানে ॥

কথায় বলে 'ভাগ্যবানের বউ মরে'। বিপত্নীকরা ভাগ্যবান কিনা বলা শক্ত, তবে বিপত্নীক যদি পুনরায় দার পরিগ্রহে উৎসাহিত হন তবে ভাগ্য কদাচিৎই প্রসন্ন হয়। কেন না দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর বশ্যতা স্বীকার করে তাকে থাকতে হয়। আর এর অভিজ্ঞতা যে মোটেই সুখকর হয় না তার পরিচয় আমরা পাই এই প্রবাদটিতে যেখানে বলা হয়েছে—

দোজবরের মাগ গজরা হাতী, ভাতারকে মারে তিন লাথি ॥

একটি প্রবাদে দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর দোর্দণ্ড প্রতাপকে সুন্দরবনের বাঘের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে—

দোজবরের মাগ সোঁদর বনের বাঘ ॥

এ গেল দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর সম্পর্কে, অনেকক্ষেত্রে দুঃসাহসী মানুষ আবার এর পরেও এগিয়ে যায়, অর্থাৎ তৃতীয়, চতুর্থ পক্ষ পর্যন্ত। সেক্ষেত্রে তৃতীয়-চতুর্থ পক্ষের স্ত্রীদের আচরণ কিরকম হয় তার পরিচয় জ্ঞাপক প্রবাদে বলা হয়েছে—

একবরে ভাতারের মাগ চিংড়ি মাছের খোসা।
দোজবরে ভাতারের মাগ নিত্যি করেন গোঁসা ॥
তেজবরে ভাতারের মাগ সঙ্গে বসে খায়।
চারবরে ভাতারের মাগ কাঁধে চড়ে যায় ॥

আমাদের পারিবারিক তথা সামাজিক জীবনে নানা বিধিনিষেধ মেনে চলতে হয়, অন্ততঃ এককালে হ'ত। আইন আছে যেমন, তেমনি আছে তার ফাঁক। কিন্তু সেই ফাঁক যে কতখানি হাস্যকর হতে পারে তার পরিচয় পাই ভাসুর-ভাদ্দর বউয়ের কথোপকথনমূলক একটি প্রবাদে। আগেকার দিনে ভাদ্দর বউ ভাসুরের সামনে উপস্থিত হ'ত না, উভয়ের মধ্যে বাক্যালাপ ছিল নিষিদ্ধ, সেক্ষেত্রে ভাদ্দর বউ কেমন করে পরোক্ষভাবে ভাসুরের সঙ্গে বাক্যালাপ চালাত তারই একটি নমুনা—

কাঁথখান, কাঁথখান, বট্‌ঠাকুর কি পাঁকাল মাছ খান ॥

—অর্থাৎ ভাসুর ঠাকুর পাঁকাল মাছ খান কিনা, ভাদ্দর বউ মাঝখানে একটি কাঁথাকে আড়াল রেখে তাই জানতে চেয়েছে ভাসুর ঠাকুরের কাছ থেকে। ভাসুর ঠাকুরও প্রত্যক্ষ উক্তি এড়িয়ে বাচ্যের পরিবর্তন ঘটিয়ে তার জবাব দিয়েছেন—

থান, থান, থান, থান পাঁচ ছয় খান।
এখন একটু তেল পেলে নাইতে যান ॥

আমাদের পারিবারিক জীবনে শাশুড়ী বউয়ের বিরোধ প্রায় এক নিত্য-কার ব্যাপার বলে অভিহিত করা চলে। এই বিরোধের মূলে যে মনস্তাত্ত্বিক কারণ আছে তার বিস্তারিত উল্লেখ না করে শুধু এইটুকু বলা যেতে পারে যে শাশুড়ী ও বউ পরস্পর পরস্পরকে প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে কল্পনা করে আর পরিণামে উভয়েই উভয়ের বিরাগভাজন হয়ে থাকে। কেউ কাউকে সহ্য করতে পারে না। একটি প্রবাদে পুত্রবধূ সম্পর্কে চরম শ্লেষ অভিব্যক্ত হয়েছে। বলা হয়েছে—

বউ নয়—বোবা, বউ নয় বাবা ॥

একেই ত স্বামীরা সচরাচর বউয়ের কথাতেই চলে, তার ওপর বউ যদি সুন্দরী হয়, তাহলে ত কথাই নেই। মা-বাবা হয়ে যায় পর, ছেলে, বউয়ের একান্ত অনুগত হয়ে তার কথামত চলে। সেই কারণে একটি প্রবাদে সুন্দরী বউ ঘরে না আনতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে পরিবারের বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে—

ঘর বাঁধো খাটো, গরু কেনো ছোটো।
বিয়ে কর কালো, তাই গেরস্থের ভালো॥

কথায় বলে 'যাকে দেখতে নারি, তার চলন বাঁকা'। শাশুড়ীর কাছে যেহেতু পুত্রবধূ অপ্রিয়, তাই একাধিক প্রবাদে তার আচরণের বিরূপ সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছে। যেমন একটি প্রবাদে বউয়ের খাওয়ার সমালোচনা করে বলা হয়েছে—

লাজে বউ হাঁ না করে, চালতা হেন গেরাস ধরে॥

অন্য একটি প্রবাদে বউয়ের রান্নার সমালোচনা প্রকাশিত—

শাকেই এত নাড়া, ডাল হ'লে ভাঙত হাঁড়ি, ভাসত পাড়া—পাড়া॥

মা-বাবার প্রতি সন্তানের আনুগত্যহীনতার জন্যেও পুত্রবধূকেই দায়ী করা হয়েছে। বলা হয়েছে—

কি করবে পুতে, নিত্যি সেত কান ভাঙানীর কাছে যায় শুতে॥

না, প্রবাদে যে শুধুমাত্র পুত্রবধূই সমালোচিত হয়েছে তা নয়, বেশ কয়েকটি প্রবাদে পুত্রকেও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের কশাঘাত করা হয়েছে। যেমন শ্বশুরবাড়ী নিয়ে ছেলের অধিক মাতামাতিতে অসন্তুষ্ট পিতামাতার বিরূপ-মানসিকতার অভিব্যক্তি ঘটেছে একটি প্রবাদে—

মা বাপ ডেও ঢেকনা, শালা শালাজ-নে' ঘরকন্না।

তবে পুত্র অথবা পুত্রবধূর বিরুদ্ধে বক্তব্য যত না বাবার, তার থেকে অনেক-গুণ বেশি অনুযোগ মায়ের। মা'র বক্তব্য হ'ল তাঁকে সম্মান সুখ থেকে বঞ্চিত করে পুত্র নিজের স্ত্রীকে নিয়েই বেশি মত্ত। তা না হ'লে—

মায়ের পেটে ভাত নেই—বউয়ের গলায় চন্দ্রহার॥

কিংবা—

বাছার কি দিব তুলনা,
মায়ের হাতে তুলার দাঁড়ি, বউকে পরাই ঢাকাই শাড়ি॥

এই একইরূপ বক্তব্য আরও একটি প্রবাদে প্রকাশিত—

মায়ের গলায় দিয়ে দড়ি, বউকে পরাই ঢাকাই শাড়ি॥

কর্তব্য বিমুখ, নির্লজ্জ এবং স্ত্রৈণ পুত্রকে এইভাবে প্রবাদে আক্রমণ করা

হয়েছে। উল্লেখযোগ্য শেষোক্ত প্রবাদটিতে পুত্র নিজেই নিজের কুকীর্তির কথা সোচ্চার কণ্ঠে ঘোষণা করে সকলের কাছে হাস্যাস্পদ হয়েছে।

প্রবাদে যে শুধু পুত্রবধূই অভিযুক্ত হয়েছে তা নয়, শাশুড়ীর সম্পর্কে তার বিরূপ মানসিকতা বেশ কিছু প্রবাদেই প্রতিফলিত হয়েছে। আসলে পুত্রবধূ চায় স্বাধীনভাবে সংসার করতে। সংসারের একচ্ছত্র কর্ত্রী হতে, সে কারও অধীনে থাকতে রাজি নয়। শেষপর্যন্ত তার দীর্ঘদিনের আশা বুঝি বা পূর্ণ হয়। শাশুড়ী শেষ পর্যন্ত দেহ রাখেন। বধূর মাতাও বুঝি বা হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন, ভাবেন তার মেয়ে শাশুড়ীর গঞ্জনার হাত থেকে রেহাই পেল। তাই পরম উৎসাহের সঙ্গে প্রশ্ন করেন—

একলা ঘরের গিন্নী হলি নাকি মা।

কিন্তু বধূর এতেও বিশ্বাস নেই, কি জানি তার দীর্ঘদিনের বাসনা ফলবতী যদি না হয়। তাই মায়ের প্রশ্নের উত্তরে তার সন্দিগ্ধ উত্তর—

নিশ্বাসকে বিশ্বাস নেই নড়ছে দুটো পা॥

অপর একটি প্রবাদেও শাশুড়ীর প্রতি বউয়ের দরদের নমুনা মিলবে।—

শাশুড়ী মলো সকালে।
খেয়ে দেয়ে বেলা থাকে ত কাঁদব আমি বিকালে॥

কথায় বলে 'যা নারী সা লজ্জাশীলা'। অর্থাৎ লজ্জাই নারীর ভূষণ। একটি প্রবাদে নারীর সেই লজ্জার নামে চরম নির্লজ্জতার পরিচয় মিলবে—

শুন গো শ্বশুর, শুন গো ভাসুর, বলি তোমাদের পায়।
আর রণে মাততে গেলে গামছা থাকে না গায়॥

বিবদমানা এই নারীর মূর্তিটি মানসচক্ষে কল্পনা করতেও শিউরে উঠতে হয় বোধকরি।

শুধু শাশুড়ীই নয়, শাশুড়ীর পুত্রটি মানে স্বামীদেবতাটিকেও ছেড়ে কথা বলা হয় নি। শাশুড়ীকে উদ্দেশ করে সৃষ্ট একটি প্রবাদে বলা হয়েছে—

ঠাকরুণের গর্ভ চমৎকার ; বিইয়েছেন বাঁদর অবতার॥

যে স্বামী স্ত্রীর গায়ে হাত তোলে, স্বভাবতঃই তার সম্পর্কে বিরূপ.

মানসিকতার প্রতিফলন যে প্রবাদে ঘটবে, তা সহজেই অনুমেয়। একটি প্রবাদে যেমন প্রহারকারী স্বামীর সম্পর্কে বলা হয়েছে—

দরবারে সুখ না পায়, ঘরে এসে মাগ ঠেঙ্গায়॥

বাড়ীতে যদি পান্তা ভাত থাকে সচরাচর বাড়ীর মেয়ে বিশেষত বউয়েরাই তা খায়। কিন্তু প্রবাদে এর বিপরীত চিত্র উপস্থাপিত। স্বামীকে পৌরুষের দোহাই দিয়ে পান্তা ভাত ভক্ষণে প্রলুব্ধ করে স্ত্রী নিজের শারীরিক অসুস্থতার দোহাই দিয়ে গরম ভাত খাওয়ার কথা বেশ উচ্চকণ্ঠেই ঘোষণা করেছে—

পান্তা ভাত ভক্ষণ, এই ত পুরুষের লক্ষণ।
আমি অভাগী ভাত খাই, কোন্ দিন বা মরে যাই॥

একটি প্রবাদে নিছক বাড়ী বসে কীর্ত্তন শোনার প্রলোভনে স্বামীর মৃত্যু কামনাও ব্যক্ত হয়েছে নিদারুণভাবে—

ঈশ্বর যদি করেন, কর্ত্তা যদি মরেন,
তবে ঘরে বসেই কেত্তন শুনব॥

শাশুড়ী, বিশেষত স্বামী-সম্পর্কেই যদি এ ধরনের মনোভাবের পরিচয় আমরা পাই, সেক্ষেত্রে ননদ সম্পর্কে বক্তব্য যে কিরূপ হবে বা হওয়া স্বাভাবিক তা সহজেই অনুমেয়। ননদকে কুমীরে ধরে নিয়ে যাওয়ার মত দুঃসংবাদও শাশুড়ীকে সঙ্গে সঙ্গে জানাতে বিস্মৃত হয়ে গেছে গৃহবধূ। শুধু তাই নয় ননদের এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা নিয়ে বিন্দুমাত্র দুঃখিত হওয়া দূরের কথা, উপরন্তু নির্মম রসিকতা করতেও তার বাধেনি—

ভাল কথা পড়ল মনে আঁচাতে আঁচাতে।
ঠাকুরঝিকে নিয়ে গেল নাচাতে—নাচাতে।
ঠাকরুণ গো ঠাকরুণ,
জলের ভেতর তোমাদের কি কুটুম আছে॥

এইবার বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষকে নিয়ে সৃষ্ট প্রবাদে যে হাস্যরসের পরিচয় পাওয়া যায় তার সন্ধান নেওয়া যেতে পারে।

ব্রাহ্মণ দক্ষিণা লোভী। তাই উপযুক্ত দক্ষিণা পেলে মানুষ তো কোন

ছার, ঢেঁকির নামে সঙ্কল্প করে চণ্ডী পাঠ করতেও তার নাকি কোন আপ
থাকে না—

বামুনে দক্ষিণা ধরে ঢেঁকির নামেও চণ্ডী পড়ে॥

ব্রাহ্মণের নামের সঙ্গে যে বিশেষণটি প্রায়শই যুক্ত হয়ে থাকে, সেটি হ
তার উদর সর্বস্বতা তথা ভোজন বিলাসিতা। ব্রাহ্মণ খেতেও পারে পরিমা
অনেক। তাই তার উদর ছিটে বেড়ার ঘরের সঙ্গে উপমিত হয়েছে—

ব্রাহ্মণের উদর, ছিটে বেড়ার ঘর।

একটি প্রবাদে ত ফলাহারের লোভে মৃত ব্রাহ্মণেরও পুনরুজ্জীবন লাভে
কথা বর্ণিত হয়েছে—

মরা বামুন গাঙ্গে ভাসে, চিঁড়ে দইয়ের নামে উঠে আসে॥

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভট্‌চায্যি বামুনের সঙ্গে বিদ্যাচর্চার কোন সম্প
থাকে না একটি প্রবাদে এই বিষয়টি নিয়ে বলা হয়েছে—

বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্যের পূজার বড় ঘটা।

শুধু ব্রাহ্মণ নয়, অন্যান্য বৃত্তিভোগীদের নিয়েও প্রবাদে ব্যঙ্গ-পরিহাস ক
হয়েছে। যেমন কবিরাজের সম্পর্কে বলা হয়েছে—

লাথি চড়ে নাহি লাজ, আমার নাম কবিরাজ॥

কবিরাজের ঔষধের এবং তার হাতযশের পরিচয় দেওয়া হয়েছে এক
প্রবাদে এইভাবে—

আমার এমনি হাতযশ,
এ পাড়ায় যদি ওষুধ খাওয়াই, ও পাড়ায় মরে গণ্ডা দশ॥

অপর একটি প্রবাদেও কবিরাজদের বিদ্রূপ করে বলা হয়েছে—

চূর্ণ, চিন্তা, চালবাজি, তিন নিয়ে কবিরাজী॥

শুধু কবিরাজ নয়, ডাক্তারও সমালোচনার হাত থেকে রেহাই পায়নি—

জল, জোলাপ, জোচ্চোরি, এই তিন নিয়ে ডাক্তারি॥

প্রবাদে যেমন ব্রাহ্মণকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে, তেমনি ব্যঙ্গ করা হয়ে
কায়স্থদেরও। কায়স্থকে কাকের মতো প্রাণীরাও ভয় পায়। এমনকি কায়
মারা গেলেও তাদের ভয় ঘোচেনা, কারণ কায়স্থদের অসাধ্য কিছুই নেই—

কায়েতের মড়া কাকেও ঠোক্‌রায় না ॥

এই প্রবাদটিও আমাদের হাসির উদ্রেক না করে পারে না—

কায়েত মরে জলে ভাসে, কাক বলে—ফিকিরে আসে ॥

অর্থাৎ কায়স্থদের পক্ষে মৃতের ভান করে কাকদের ধরাও কিছু অসম্ভব ব্যাপার নয়। ভক্ত যারা তারাও প্রবাদে কটাক্ষের হাত থেকে রেহাই পায়নি। আপাত বৈরাগ্যের অন্তরালে চরম বিলাসিতায় নিমজ্জিত তথাকথিত কৃচ্ছ্রসাধনকারী ভক্তদের উদ্দেশে বলা হয়েছে—

যুবতীর কোল, সিঙি মাঝের ঝোল, মুখে হরিবোল।

বৈষ্ণব এবং বৈরাগীদেরও ছেড়ে কথা বলা হয়নি প্রবাদে—

দুদিন হয়েছেন বৈরাগী, ভাতেরে বলেন পরসাদ ॥

কিংবা,

কাঁদে পরাণ—কাছিমের লাগে, নাম রটেছে বৈরাগী ॥

অথবা, সাধে কি বৈরাগী নাচে, ভাতের থালা হাতের কাছে ॥

অর্থাৎ বৈরাগীর নৃত্যের মূলে যত না তার ভক্তি, তদপেক্ষা প্রস্তুত আহার্যের প্রেরণাই সমধিক।

শেষ বেলা ভগবানকেও কটাক্ষ করে বলা হয়েছে—

হরি বড় দয়াময়, কথায় বটে কাজে নয় ॥

ঝগড়াটে মহিলার কথাও প্রবাদে স্থান পেয়েছে। ঝগড়া করার সুযোগ লাভে বঞ্চিত বলে তাদের কিরকম কাহিল অবস্থা হয়, তার বিবরণে হাস্যরসের উদ্রেক না হয়ে পারে না—

কুঁদুলে নাড়ী কোঁ কোঁ করে, কোঁদল নইলে থাকতে নারে ॥

ঝগড়া করতে উদ্যত নারীর চিত্র পাই একটি প্রবাদে—

মিনসের কোলে ছেলে দিয়ে মাগী যায় লড়ায়ে ধেয়ে।

বলাবাহুল্য, এক্ষেত্রে 'লড়াই' বলতে ঝগড়াকেই বোঝান হয়েছে।

কুৎসিত দর্শনা মেয়েকে ব্যঙ্গ করে বলা হয়েছে একটি প্রবাদে—

কিবা মেয়ের ছিরি, বাঁশ বনের প্যারী।

অনুরূপভাবে একটি প্রবাদে, ছেলের রূপ নিয়েও বিদ্রূপ করা হয়েছে—

বাছার আমার কিবা রূপ, ঘুঁটে ছায়ের নৈবিছি খেংরা কাঠির ধূপ ॥

অর্থহীন জলুস এবং আত্মম্ভরিতা প্রবাদের রাজ্যে বেশ ভালমত বিদ্রূপ বাণের সম্মুখীন হয়েছে দেখা যায়। যেমন—

ক. ঘরে নেই ঘটি বাটি, কোমরে মেলাই চাবিকাঠি ॥

খ. পেটে ভাত নেই, ঠোঁটে আলতা ॥

গ. খেতে পায়না শাক সজনা, ডাক দিয়ে বলে-ঘি আন না ॥

সমাজে এমন অনেকে আছে যাদের স্বভাব হল কেবল অপরের ছিদ্রান্বেষণ করে বেড়ান। অথচ এইসব ছিদ্রান্বেষণকারীরা নিজেরা কিন্তু ত্রুটিমুক্ত নয়। এদের তাই স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে একাধিক প্রবাদে এই ভাবে—

ক. গুয়ে বলে গোবরদাদা, তোর গায়ে বড় গন্ধ।

খ. রসুন বলে পেঁয়াজ ভাই, তোর গন্ধে মোরে যাই ॥

গ. পেঁচা পিঁপড়েকে বলে—সর লো সর, খেবড়ামুখী ॥

ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ এবং পরিহাসের হাত থেকে প্রেম-প্রীতির বাড়াবাড়ি এবং প্রেমিকের অসম্ভব কল্পনাও বাদ পড়েনি—

ক. পিরীতের নৌকা পাহাড়েও চলে।

খ. পিরীতের কত খেলা বুঝে ওঠা ভার।
চুলের সাঁকোয় তুলে দিয়ে করায় সাগর পার ॥

যোগ্যতার তুলনায় মানুষ যখন আশা করে বেশি, তখন তা স্বভাবতঃই নিতান্ত হাস্যকর হয়ে ওঠে। প্রবাদে এই ধরণের হাস্যাস্পদ ব্যক্তিদেরও এক হাত নেওয়া হয়েছে—

কত সাধ যায় রে চিতে, বেগুন গাছে আঁকশি দিতে ॥

কিংবা, কত সাধ যায় রে চিতে, মলের মাথায় চুট্‌কি দিতে ॥

অথবা, কত সাধ যায় রে চিতে, ফোগলা দাঁতে মিশি দিতে ॥

ওপরে ওপরে লজ্জা, কিন্তু আসলে চরম নির্লজ্জতার অধিকারী যারা, তাদের আচরণও কম হাস্যকর নয়। আর তাইতো এরাও প্রবাদের বিষয় হয়ে উঠেছে স্বাভাবিকভাবেই—

খাব না খাব না অনিচ্ছে, তিন রেক চাল এক উচ্ছে ॥

এইভাবে অসংখ্য প্রবাদে আমরা ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ এবং নির্মল অথবা নির্মম রসিকতার পরিচয় পাই, যা বাঙ্গালীর অন্যবিধ এক মানসিকতার পরিচয়কে উদ্ঘাটিত করে থাকে।

ঘ. ধাঁধার মধ্য দিয়ে যতই কেন পরিণত শিল্পমন অথবা রসবোধের পরিচয় পরিস্ফুট হোক, আপাতভাবে ধাঁধা যতই কেন বুদ্ধিবৃত্তি অনুশীলনের উৎকৃষ্ট মাধ্যম বলে প্রতিভাত হোক, তবু একথা অস্বীকার করার কোনই কারণ নেই যে মূলত, হাস্যরস সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই ধাঁধার সৃষ্টি। কোন কোন ক্ষেত্রে ধাঁধার আচারগত মূল্যও হয়ত আছে, তবু তা হল ধাঁধার গৌণ পরিচয়। নিছক এজন্যে ধাঁধার সৃষ্টি—একথা ঠিক মেনে নেওয়া যায় না। সমগ্র লোক-সাহিত্যের অন্তর্গত নানাবিধ উপাদানের মধ্যে ধাঁধার মধ্যে বাঙালীর রসবোধের যে গভীরতর পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনটি অন্যত্র দুর্লভ।

যে উদ্দেশ্যে ধাঁধাগুলির সৃষ্টি, তাতেই রয়েছে একপ্রকার অবিমিশ্র কৌতুকরস সৃষ্টি তথা উপভোগের মানসিকতা। যে বস্তু বা প্রাণী আমাদের অতি পরিচিত, প্রতিদিনের জীবনে যার ব্যবহার, আমাদের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতায় যা নাকি ওতপ্রোতভাবে যুক্ত, তাকেই ইচ্ছাকৃত ভাবে জটিল বর্ণনার দ্বারা যখন আমাদের সামনে উপস্থিত করা হয়, তখন সেই অতিপরিচিত বস্তু বা প্রাণীটির সন্ধানলাভ আর সহজসাধ্য থাকেনা। শেষ-পর্যন্ত যখন ইচ্ছাকৃত ভাবে রচিত জটিল বর্ণনার আবরণটি ভেদ করে প্রকৃত মীমাংসাটি বেরিয়ে আসে, তখন আমরা যার পর নাই শুধু পুলকিত হইনা, আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়ি। অবশ্যই এক্ষেত্রে স্রষ্টাকে যথার্থ সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তির পরিচয় দিতে হয়, আর দিতে হয় প্রকৃত মীমাংসাটিকে গোপন রেখে অন্যবিধ বিষয়ের প্রতি শ্রোতার মনকে নিযুক্ত রাখার ব্যাপারে মুন্সীয়ানার পরিচয়। কারণ বর্ণনা যদি হয় এমন যে শ্রোতা তা শোনামাত্রই প্রকৃত মীমাংসাটির সন্ধানলাভে সমর্থ হয়, তাহলে মজা উপভোগের পরিমাণটা সেক্ষেত্রে অনেকটা হ্রাস পায়। অবশ্য এক্ষেত্রে আর একটা বক্তব্য বলে

রাখা প্রয়োজন যে বর্ণনার রঙ্গীন জালটিকে অনুসরণ করে কোন সার্থক বিকল্প মীমাংসার সন্ধান শ্রোতা দিলেও তা গ্রাহ্য হয় না। পূর্ব থেকে নির্দিষ্ট মীমাংসাটিরই উল্লেখ প্রয়োজন। তবে এ নিয়ে শ্রোতার সঙ্গে প্রশ্নকর্তার কখনও কোন বিরোধ বাধেনা। শ্রোতা প্রশ্নকর্তার নির্দিষ্ট মীমাংসাটিকেই হাসিমুখে স্বীকার করে নেয়। যদি একমাত্র বুদ্ধিবৃত্তি অনুশীলনের জন্যই ধাঁধার সৃষ্টি হত তাহলে সেক্ষেত্রে কখনই শ্রোতা প্রশ্নকর্তার নির্দিষ্ট মীমাংসাটিকে সকলক্ষেত্রে মেনে নিত না। এ'ত গেল ধাঁধার মাধ্যমে হাস্যরস সৃষ্টির একটি কারণ। অন্যবিধ কারণও আছে। এই প্রসঙ্গে ধাঁধার মাধ্যমে যে সব বিষয় উপস্থাপিত করা হয় সেগুলির হাস্য রসাত্মক প্রকৃতির কথাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তদুপরি বেশকিছু ধাঁধায় বিশেষ বিশেষ শব্দ নিয়ে ইচ্ছাকৃত ভাবে অর্থ পার্থক্য ঘটিয়েও কৌতুক রস সৃষ্টি করতে দেখা যায়। এইবার কয়েকটি ধাঁধার উল্লেখে উপরোক্ত বক্তব্যের বিশদ পরিচয় নেওয়া যেতে পারে। প্রথমেই ধাঁধার বিশেষ আঙ্গিকের পরিচয় গ্রহণ করা যেতে পারে, যে উপস্থাপনা রীতি ধাঁধাকে বিশেষ ভাবে আকর্ষণীয় এবং উপভোগ্য করে তোলে।

যেমন একটি ধাঁধা হ'ল—

একটুখানি জলে
মাছ চুড়বুড় করে
জেলের মেয়ের সাধ্য নাই
সেই মাছ ধরে।

ধাঁধাটি শুনলে শ্রোতার মনে মাছের কথাই প্রথমে জাগবে। কিন্তু এই ধাঁধাটিতে মোটেই মাছের কোন ভূমিকা নেই। আসল মীমাংসাটি হ'ল 'উনানে ভাত রান্না'। শ্রোতা যখন মাছের চিন্তায় ব্যাপৃত, ভুলেও তার মনে ভাতের কথা আসবেনা, সেই সময় যখন তাকে বলা হবে উনানে ভাত রান্নার কথা, তখন সে মীমাংসাটি উপভোগ না করে পারবেনা। মুখে তখন তার মৃদু হাসি ফুটবেই—সে হাসি কিছুটা বেকুব হবার কারণেই সম্ভবত।

আর একটি ধাঁধা, এটি জুতোকে নিয়ে—

চামড়ার দেহ তার, হাড় মাস নাই।
এদেশ ওদেশ ঘোরে তারা দুটি ভাই॥
পদানত পায়ে পায়ে লোকে যায় তেড়ে।
রাগিলে উড়ে গিয়ে পিঠে গিয়ে পড়ে॥

'ঢোল' নিয়ে রচিত একটি ধাঁধা—

কাঁধে আসে কাঁধে যায়
বিনা দোষে মার খায়।

হঠাৎ শুনলে কোন জড় পদার্থের কথা প্রথমে মনে আসবেনা, মনে আসবে কোন প্রাণীর কথা; কিন্তু যখন মীমাংসাটি 'ঢোল' বলে বলা হবে, তখন বর্ণনার সঙ্গে ঢোলের ব্যবহারগত সাদৃশ্যের সন্ধান লাভ কৌতুকরস সৃষ্টির কারণ হয়ে ওঠে।

এইবার অন্য একটি ধাঁধার উল্লেখ করা হল—

একমুখা দুইজন থাকে একদেশে।
দেখাশুনা নাই তার কোনই দিবসে॥
শযন করিলে তারা উঠিতে না পারে।
বাপে বেটায তারে সমাদর করে॥

এটির মীমাংসাও সহজে শ্রোতার মনে আসবেনা যদি না পূর্ব থেকেই অবশ্য সেটি জানা থাকে। মীমাংসাটি হল 'স্তন'। মীমাংসাটি বলার পর ধাঁধার বক্তব্যকে আর শ্রোতার পক্ষে অস্বীকারের উপায় থাকেনা।

'ভরা কলসী' নিয়ে রচিত একটি ধাঁধার বিবরণ হল এই রকম—

যুবতী ধরিয়া কক্ষে করে আলিঙ্গন
নিতম্বে রাখিয়া দেয় করিয়া যতন,
গুরুজন থাকিলেও চক্ষের উপরে
লাজলজ্জা পরিহরি কত শব্দ করে।

আপাতভাবে এই বিবরণে যুবতীর সম্ভোগ চিত্র শ্রোতার মনে জেগে উঠবে। আর সেই সঙ্গে সম্ভোগরতা যুবতীর নির্লজ্জ আচরণে মন কিছুটা তার ওপর

বিরূপ হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু যখন জানা যায় যে 'ভরাকলসী' প্রসঙ্গে এই বক্তব্য, তখন নিজের কল্পনা দৈন্যের জন্যে সলজ্জ হাসি পাবেই।

অনুরূপ ভাবে আর একটি ধাঁধা হল রামচন্দ্র পুত্র 'কুশ' কে নিয়ে—

হায় বাবা কি হইল
বিনা বাপে ছা হইল
ছা হইল যখন
মা ছিল না তখন।

ধাঁধাটি থেকে প্রথমে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে বিনা পিতায় যখন সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে তখন হয়ত বা সন্তানটির জননীর চরিত্র ভাল নয়, কিন্তু তার পরই যখন বর্ণিত হল যে সন্তান প্রসব কালে স্বয়ং জননীই ছিল অনুপস্থিত, তখন শ্রোতার এই হেঁয়ালীতে বিস্মিত হওয়া ছাড়া গতি থাকে না। তারপর সমাধানটি জানতে পেরে একদিকে যেমন তার দুশ্চিন্তার অবসান হয় আর সেইসঙ্গে মুখে ফুটে ওঠে প্রসন্ন এক হাসি। সীতা বাল্মীকির কাছে পুত্র লবকে রেখে নদীতে গিয়েছিলেন। কিন্তু এরপরই লব মুনির কাছ থেকে চলে যায় জননীর কাছে। বাল্মীকি তা বুঝতে পারেন নি। তিনি ভীত হয়ে কুশ থেকে লবের অনুরূপ সন্তানের সৃষ্টি করেন। পরে সীতা লব সহ ফিরে এলে বাল্মীকির ভ্রম ধরা পড়ে। যাইহোক সীতা কুশকে নিজের সন্তান জ্ঞানে গ্রহণ করেন। এই হল কুশের সৃষ্টি রহস্য। অতএব শুধু পিতা ব্যতীতই যে তার জন্ম হয়েছে তাই নয়, জন্মের সময় জননীও যে অনুপস্থিত ছিল এটাও একপ্রকার সত্য।

তেঁতুল সম্পর্কে একটি ধাঁধায় বলা হয়েছে—

ছোট বেলায় খেলেছি দুলেছি কাপড় পরেছি
বড় হয়ে নেংটা হয়ে বাজারে গেছি।

আপাতভাবে বর্ণনা শুনে কোন বয়স্ক অথবা বয়স্কা মানুষের কথা মনে হবে যে নাকি ছেলেবেলায় কাপড় পরে লজ্জা নিবারণ করেছিল কিন্তু বয়সকালে সে কাপড় পরিত্যাগ করেই শুধু ক্ষান্ত থাকেনি, সেই অবস্থায় বাজারে পর্যন্ত উপস্থিত হয়েছে। স্বভাবতঃই এই ধরণের নির্লজ্জ আচরণের জন্য

আচরণকারী সম্পর্কে মন যখন বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে, সেইসময় তেঁতুলের কথা শুনে মনটা একদিকে যেমন হতচকিত হয়ে যায়, সেইসঙ্গে শেষ পর্যন্ত বক্তব্যের বিষয় অবহিত হলে হাসির উদ্রেক হয়। কাঁচা অবস্থায় তেঁতুল খোলার মধ্যে থাকে। একেই কাপড় পরিহিত অবস্থা বলে বলা হয়েছে। তারপর পাকলে পরে তেঁতুলের খোলা ছাড়িয়ে তা বাজারে বিক্রয় করতে নিয়ে যাওয়া হয়। একেই বলা হয়েছে উলঙ্গ অবস্থা বলে।

উপস্থাপনার গুণে ধাঁধা কিরকম চমৎকারিত্বের সৃষ্টি করে, তার আর একটি উদাহরণ—

হাসতে হাসতে বস্‌লো নারী পরপুরুষের কাছে।
হস্তাহস্তি কস্তাকস্তি ভিতর যাবার আগে।
ভিতর গিয়ে শীতল হল।
যে ভাবটি মনে করেন, সে ভাবটি নন॥

এটি শুনেই সর্বাগ্রে মনে জাগবে স্ত্রী-পুরুষের সঙ্গমের কথা। কিন্তু ধাঁধাটির শেষ পংক্তিতে যা বলে দেওয়া হয়েছে, তাই সত্য। অর্থাৎ মোটেই এখানে সঙ্গমের কথা বলা হয়নি, বলা হয়েছে নারীর শাঁখা পরার কথা। সঙ্গমের চিত্র যে ভোজবাজির মতন নারীর শাঁখা পরার চিত্রে রূপান্তরিত হতে পারে, তা ধাঁধা ছাড়া অন্যত্র দুর্লভ।

এইবার ধাঁধার কৌতুককর বিষয়ের কয়েকটি নিদর্শন উল্লিখিত হ'ল। একটি ধাঁধা হ'ল এইরকম—

নাকুবাবুর কন্যাটি হাতুবাবু নিলে।
এমন সুন্দর কন্যাটি পথে ফেলে দিলে॥

আপাতভাবে মনে হবে যে নাকুবাবু নামীয় কোন ব্যক্তির কন্যাটিকে হাতুবাবু নামীয় এক নির্দয় প্রকৃতির ব্যক্তি গ্রহণ করে শেষপর্যন্ত কন্যাটিকে পথে ফেলে দিয়ে নিজের হৃদয়হীনতার পরিচয় দিয়েছে। যখন হাতুবাবুর এই অমানবিক আচরণের জন্যে তার ওপর শ্রোতার ক্রোধ জন্মাবে, তখন আসল মীমাংসাটি যদি বলা হয় 'সিকনি', স্বভাবতঃই এই দুইয়ের মধ্যেকার সম্পর্কহীনতায় শ্রোতা না হেসে পারবে না।

কিংবা অপর একটি ধাঁধা হ'ল—

বিনা ঝড়ে খেঁজুর পড়ে।

এই ধাঁধাটি শুনলে মনে হবে যে সত্য-সত্যই ঝড় ব্যতিরেকে বুঝিবা খেঁজুর গাছ থেকে পাকা খেঁজুর পড়ার কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু তারপরই যখন সমাধানটি বলা হবে 'ছাগলের নাদি', তখন শ্রোতার পক্ষে আর কি গাম্ভীর্য রক্ষা সম্ভবপর? এইবার একই শব্দকে ধাঁধায় ভিন্ন ভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করে কেমন কৌতুকরস সৃষ্টি করা হয় তার কয়েকটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা গেল। যেমন—

'উড়ে যা মাটিতে পা',

কিংবা, এক বেটা উড়ে যায়

তার মধ্যখানে নাই।

এখানে 'উড়ে' শব্দটিতে আপাতঅর্থে উড়ে যাওয়াকে বোঝান হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত অর্থে আর এটি ক্রিয়াপদ থাকেনি, হয়ে গেছে বিশেষ্য। তখন অর্থ দাঁড়িয়েছে 'উড়িয়া' নামক বিশেষ এক জাতিকে। 'নাই' শব্দটি আপাত-ভাবে অনুপস্থিত অর্থে ব্যবহৃত, কিন্তু প্রকৃত অর্থে হল 'নাভি'।

শুনো শুনো ঠাকুরপো হে শুনো মোর কথা,

এর উত্তর থেনো ভাঙ্গিলে

খাও মোর মাথা।

জলেতে দিতেছি জাল সারা দিন ধরে,

এখনো উঠলো না জল কপালের ফেরে।

এখানে চতুর্থ পংক্তিটিতে ব্যবহৃত 'জাল' শব্দটি আপাতভাবে 'ফোটানো' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে বলে মনে হবে। কিন্তু আসলে শব্দটি মাছ ধরার জাল অর্থে প্রযুক্ত। আর এই অর্থেই সমগ্র ধাঁধাটি রচিত।

সবশেষে আর এক শ্রেণীর ধাঁধার উল্লেখ করতে হয়। এগুলিকে বলা হয়েছে আক্রমণাত্মক ধাঁধা। এই শ্রেণীর ধাঁধাতে প্রশ্নকর্তা শ্রোতাকে কিছুটা আক্রমণ করে থাকেন, অবশ্যই সে আক্রমণ কথার মাধ্যমে। এই শ্রেণীর ধাঁধায় শ্রোতাকে এক ধরণের চ্যালেঞ্জ জানান হয়, কখনও কখনও প্রলোভনও

দেখান হয়ে থাকে। তবে সে সবই কথার কথা মাত্র। চ্যালেঞ্জ রাখা হলেও যা না হলেও তা। আসলে এই চ্যালেঞ্জে কোন বিদ্বেষের ভাব থাকে না। তাই কোন তিক্ততার সৃষ্টি হয় না। নিছক নির্মল পরিহাসপ্রিয়তাই এইসব চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট। এই রকম একটি ধাঁধা হল—

রক্তে ডুবু ডুবু কাজলের ফোঁটা,
এক কথায় যে বল্‌তে পারে
সে মজুমদারের বেটা।

এখানে ঠিকমতো জবাব দিতে পারলে উত্তরদাতা 'মজুমদারের বেটা' হবার মতন 'দুর্লভ' সম্মানের অধিকারী হবে বলে প্রলোভন দেখান হয়েছে। বলাবাহুল্য জবাব না দিতে পারলে যদি উত্তরদাতা 'মজুমদারের বেটা' হবার সম্মান লাভ থেকে বঞ্চিত হয় তাহলেও যে খুব ক্ষতি হয় তা নয়। যাইহোক এক্ষেত্রে সমাধানটি হ'ল 'কুঁচ'।

অনুরূপ আর একটি ধাঁধা—

কাঁচায় তুলতুল পাকায় সিন্দূর
যে না বলতে পারে সে বুড়া ইন্দুর।

এখানে সমাধানটি হ'ল 'হাঁড়ি'। ধাঁধাটির ঠিকমত যদি উত্তর দিতে না পারে, তবে শ্রোতাকে বুড়ো ইঁদুর বলে পরিগণিত হতে হবে বলে ভয় দেখান হয়েছে।

লালবরণ—ছয় চরণ—পেট কাটিলে হাঁটে।
মূর্খে কি ভাঙ্গাইবা পণ্ডিতেরই ফাটে। (আসপিঁপড়া)

বক্তব্য হল—এই ধাঁধাটি সমাধান করতে যখন পণ্ডিত ব্যক্তিদেরই হিমসিম খেতে হয়, তখন সামান্য মূর্খ ব্যক্তির পক্ষে তার সমাধান করা এককথায় অসম্ভব। আসলে উত্তরদাতাকে উত্তেজিত করতেই এই ধরণের বক্তব্য প্রকাশ করা হয়েছে, তবে এ উত্তেজনায় কোন জ্বালা নেই, নেই কোন ব্যক্তিগত আক্রোশ। আর তাই শ্রোতাও এই ধরণের চ্যালেঞ্জকে বেশ হাসিমুখেই স্বীকার করে নিতে পারে।

বেশ কয়েকটি ধাঁধায় শ্রোতা যদি ঠিকমত সেগুলির মীমাংসার সন্ধান

না দিতে পারে তাহলে তার পিতৃদেবকে নিয়েও টানাটানি করা হয়েছে। যেমন—

ক. আগা ঝন ঝন গোড়া মুঠে
যে না বলতে পারে তার বাবার নাম মুটে। (ঝাটা)

খ আগে ঝুন ঝুন গোড়া মোটা,
যে না বলতে পারে তার বাবা মোটা। (ঐ)

গ. উঠে পড়ে ঢোঁড়া সাপ
যে না কহে তার নেড়া বাপ। (ঢেঁকি)

একটি ধাঁধায় আবার প্রলোভনও দেখান হয়েছে এইভাবে—

মাছের নাই মাথা, গাছের নাই পাতা, পক্ষীর নাই ডিম !
এই যে ভাঙ্গাইতে পারে হাজার টাকা দিম্॥
(কাঁকড়া, সিজ, বাদুড়)

গ. পণ্ডিতেরা হাস্যরসকে wit, humour ইত্যাদি নানা পর্যায়ে ভাগ করে থাকেন। আমরা মোটামুটি ভাবে হাসিকে দু'টি ভাগে ভাগ করতে পারি—মুখের হাসি এবং মনের হাসি। মুখের হাসি বলতে বোঝায় উচ্ছ্বসিত হাসি, যে হাসিতে মুখাবয়বে বিকৃতি ঘটে। যে হাসি অপরের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই হাসি হয় সশব্দ। কিন্তু মনের হাসি হল তাই, যা নাকি মুখাবয়বে তেমন কোন প্রভাব ফেলতে পারে না। এই হাসিকে আমরা নীরব হাসিও বলতে পারি। মোটামুটিভাবে বাংলা লোক-সাহিত্যের হাস্যরস এই শেষোক্ত শ্রেণীভুক্ত। আবার লোক-সাহিত্যের অপরাপর উপাদানের তুলনায় ছড়ায় যে হাস্যরসের সন্ধান আমরা পাই, তা এই মনের হাসির প্রকৃষ্ট উদাহরণ। মনের হাসিতে যে এক প্রকার স্নিগ্ধতা আছে, সেই স্নিগ্ধতা বোধ করি মুখের হাসিতে অনুপস্থিত।

প্রবাদ কিংবা ধাঁধায় বাস্তবেরই একাধিপত্য। সেখানে কল্পনা কখনই লাগাম ছাড়া হতে পারে না। কিংবা বলা চলে কল্পনা বাস্তবের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে চলে। তাই প্রবাদ কিংবা ধাঁধার বক্তব্য হল যুক্তিগ্রাহ্য। কিন্তু ছড়ায় অবাধ কল্পনার রাজত্ব। ছিটেফোঁটা যেটুকু বাস্তবতার সন্ধান

এখানে মেলে, তাও কল্পনারই অনুষঙ্গ। কয়েকটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে বক্তব্যকে পরিস্ফুট করা যেতে পারে।

একটি দোলনার ছড়া হল—

দোল দোল দোলে
খোকন মণি কোলে।
ফুল গাছটির তলে ॥
মামী কাটে সরু সূতো,
মামা কাটে পাত।
সত্যি করে বলনা মামী,
মামা কি তোর বাপ ॥

এখানে ফুলগাছের তলায় খোকনমণির দোলনায় দোলার যে বিবরণ পাই, তাকে কোনমতেই অবাস্তব বলা চলে না। এমনকি মামীর সরু সূতা কাটা কিংবা মামার পাতা কাটার মধ্যেও কোনপ্রকার অস্বাভাবিকতার সন্ধান মেলে না। তবে হ্যাঁ, এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলা প্রয়োজন। সত্য সত্যই খোকনমণিকে গাছ তলায় দোলনা দিতে গিয়েই যে এইসব ছড়া রচিত কিংবা অনুরূপ পরিবেশ ছাড়া এই ছড়া অব্যবহৃত থেকে যায়, এর কোন বাধ্যবাধকতা নেই। ঘরের দালানে কিংবা অন্যত্রও দোলনা খাটিয়ে এই একই ছড়া আবৃত্তি করা যেতে পারে বা করা হয়েও থাকে। আসলে পরিবেশটা বড় কথা নয়, বড় কথা হল ছড়ার ছন্দটি, যা নাকি শিশুকে শীঘ্র নিদ্রার জগতে নিয়ে যায়। সেদিক দিয়ে ছড়ার বিবরণ বাস্তব হয়েও অ-বাস্তব। সে যাই হোক, এইবার ছড়াটির শেষ দুটি চরণ বিশেষভাবে লক্ষ্য করার। এখানে খোকনের কণ্ঠে প্রশ্ন উচ্চারিত হয়েছে মামা মামীর বাবা কিনা। খোকনের প্রশ্নে আন্তরিকতা আছে, আর আছে সত্য সন্ধানের অনুসন্ধিৎসা। কিন্তু খোকনের বকলমে যে প্রশ্নটি করা হয়েছে তা কি আমাদের মনে হাসির উদ্রেক করে না? আমাদের সামাজিক জীবনে এ-রকম অসতর্ক প্রশ্নের সঙ্গে পরিচয় লাভ কদাচিৎই ঘটে বলা চলে। ছড়ার জগতে কিন্তু এই ধরণের অসতর্ক কিংবা অ-সামাজিক প্রশ্ন ক্ষোভের পরিবর্তে

অনাবিল হাসিরই উদ্রেক করে। আর এই কারণেই ছড়া হয়ে ওঠে উপভোগ্য। আসলে শিশুদের সর্বাপেক্ষা আপন জন হ'ল মা এবং বাবা। তাই স্বভাবতঃই সব সামাজিক সম্পর্ককেই তারা মা-বাবার সম্পর্কের নিরিখে দেখতেই অভ্যস্ত। সামাজিক সম্পর্কের পার্থক্য তাদের বোধের অগম্য। ছড়ায় অবশ্য তাতে কিছুই যায় আসে না।

অনুরূপ বক্তব্য সমন্বিত আরো একাধিক ছড়ার পরিচয় আমরা পাই। যেমন—

খোকাবাবু চৌধুরী
গাঁ পেয়েছে আগুড়ি।
মাছ পেয়েছে পবা,
আমার খোকামণির বউ ডাকছে,
ভাত খাওসে বাবা।

এই ছড়াটির শেষ দুটি চরণে দেখা যাচ্ছে খোকামণিকে তার বউ 'বাবা' বলে সম্বোধন করেছে। বাস্তব জগতে স্বামীকে তার স্ত্রী পিতৃসম্বোধন করেছে —এ কল্পনার অতীত ব্যাপার। কিন্তু ছড়ায় খোকামণির বউ অবলীলাক্রমে তার শিশু স্বামীকে 'বাবা' বলে সম্বোধন করেছে। আর বড় কথা হ'ল এই অস্বাভাবিক সম্বোধনে আমরা মোটেই অপ্রস্তুত হই না, ছড়ার রাজ্যে এই-টাই যেন স্বাভাবিক। তবে একথাও স্বীকার্য যে এই সম্বোধনের গুণেই যেন ছড়াটি অধিকতর উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের সংগ্রহেও প্রায় এই রকমই একটি ছড়ার সন্ধান আমরা পাই। তবে রবীন্দ্রনাথ সংগৃহীত ছড়ার বৈশিষ্ট্যটি হল এখানে শ্রোতাকে আগেভাগেই খোকনের বউটির প্রকৃতি সম্বন্ধে অবহিত করে দেওয়া হয়েছে।

ছড়াটি হ'ল—

খোকন মোহন চৌধুরী,
বউটি হবে সুন্দরী।
একটু ন্যাকা হাবা,
রেঁধে বেড়ে ডাকবে খোকায়

ভাত খাওসে বাবা।

এ পর্যন্ত গেল দোলনা এবং ভোজন সংক্রান্ত ছড়ার সামান্য পরিচয়। এইবার ঘুম পাড়ানি কয়েকটি ছড়ায় হাস্য রসের সন্ধান করা যেতে পারে। এই ছড়াগুলিতেও বক্তব্যের চরম অসংগতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কিন্তু ছড়ার ধর্ম অনুযায়ী এক্ষেত্রেও মনে রাখতে হবে ছড়ার মাধ্যমে সুরজাল সৃষ্টিই স্রষ্টার মুখ্য উদ্দেশ্য, বক্তব্য হল গৌণ ব্যাপার। একটি ঘুম পাড়ানি ছড়ায় বলা হয়েছে—

আয় ঘুম আয় ঘুম কলা বাগান দিয়ে,
হেঁড়ে পানা মেঘ করেছে।
লখার মা নথ পরেছে কপাল ফুটো করে॥
আমানি খেতে দাঁত ভেঙ্গেছে সিঁদুর পরবে কিসে॥

এখানে ঘুমকে সজীব বলে কল্পনা করায় সমাসোক্তি অলঙ্কার হয়েছে। অবশ্য এই কারণে ছড়াটিকে বর্তমান আলোচনায় উল্লেখ করা হয় নি, উল্লেখ করা হয়েছে শেষের চরণ দু'টির জন্যে। বলা হয়েছে লখার মা নথ পরেছে —অবশ্য তাতেও কারো কিছু যায় আসে না। কিন্তু তখনই শ্রোতার মনে চাঞ্চল্যের শিহরণ জাগে, যখন সে শোনে এই নথ পরতে লখার মাকে কপাল ফুটো করতে হয়েছে। বাস্তবে কারো মাকে মহমূল্যবান নথ দেবার প্রতিশ্রুতি দিলেও কি তিনি তাঁর কপাল ফুটো করতে সম্মত হবেন? তার থেকেও বড় কথা হল কপাল ফুটো করার সঙ্গে নথ পরার কোনই সম্পর্ক নেই। কিন্তু ছড়ার রাজ্যের মজাই এমনি যে নথ পরতে নাক বা কান নয়, একেবারে কপাল ফুটো করতে হয়। তর্কের খাতিরে তাও নয় ধরে নেওয়া গেল নথ পরার সঙ্গে কপাল ফুটোর সম্পর্ক আছে। কিন্তু আমানি খেতে লখার মার দাঁত ভাঙ্গে কি করে? আর যদিই বা দাঁত ভাঙ্গল ত তার ফলে সিঁদুর পরা আটকাবে কেন? অবশ্য দাঁত ভাঙ্গার সঙ্গে সিঁদুর পরার কোন সম্পর্ক না থাকলেও নথ পরার কারণে যেহেতু তাকে কপাল ফুটো করতে হয়েছিল, সেই কারণেই সিঁদুর পরার সুযোগ লাভ সম্ভবত অন্তর্হিত।

অন্য একটি ঘুমপাড়ানি ছড়ায় আবার ভালুকের তেঁতুল খাওয়ার কথা

বলা হয়েছে। শুধু তেঁতুল বড় টক, তাই এর সঙ্গে প্রয়োজন হয় নুনের। বেচারী ভালুককে তাই নুনেরও সংস্থান করে নিতে হয়েছে এইভাবে—

আয় ঘুমানি আয়,
ভালুকে তেঁতুল খায়।
নদীর বালি ঝুর ঝুরানি,
নুন ব'লে ব'লে খায়।

অপর একটি ছড়াতে ভালুকের স্থান দখল করে নিয়েছে সুপরিচিত বাঁদর—

আয়রে আয়রে আয়,
বাঁদরেরা দোল খায়।
তারা নুন কোথা পায় ?
অনুনে রাঁধে :
ফিক্‌রে কাঁদে।
সাত রাজার নুন মেখে খায়,
সাত রাজার নুন পেয়েও
গঙ্গাচরের বালিগুলো
নুন বলে বলে খায়।
আয়রে খোকন ঘুমায়॥

ভালুকের তেঁতুল খেতে না হয় নুনের দরকার হয়েছিল, কিন্তু বাঁদরের দোল খেতে নুনের দরকার পড়ে কোন্ যুক্তিতে ? তাড়াতাড়ি ছড়ার স্রষ্টা বুঝিবা সেটা বুঝতে পেরে আমাদের দৃষ্টি অন্যত্র সরিয়ে নিলেন। বলা হ'ল নুন বিহীন অবস্থায় বাঁদরেরা রাঁধে আর তার জন্যে কাঁদে। কিন্তু পরক্ষণেই তারা এক আধটি নয়, একেবারে সাত-সাতটি রাজার নুন সংগ্রহ করে নেয়। মজার ব্যাপার হ'ল এর পরেও কিন্তু তাদের নুনের প্রয়োজন মেটে না, শেষে গঙ্গাচরের বালি, যেগুলির সঙ্গে নুনের ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য, তাই খেতে শুরু করে দেয়। নুনের যে এত প্রয়োজন, বিশেষত তা যে এতখানি উপাদেয় হতে পারে, ছড়ার জগতেই তার প্রথম সন্ধান পাওয়া গেল।

পানের প্রতি শিশুর ঝোঁক থাকা স্বাভাবিক, কারণ পানে ঠোঁট রাঙ্গা হয়। লাল রঙের প্রতি শিশুর আকর্ষণ সর্বাধিক। একটি ছড়ায় এ হেন পান শিশু খাবে বলে বলা হয়েছে কিন্তু সেইসঙ্গে শিশুটির পান খাবার কারণের সঙ্গে যুক্ত যে আচরণটির কথা বর্ণিত হয়েছে, তা বড়ই মর্মান্তিক—

টিয়ারে টিয়া
বাবু যে মোর পান খাবে
তার শাশুড়ীকে বাঁধা দিয়া ॥

অভাবের তাড়নায় কিংবা স্বভাবের দোষে নিজের বউকে বাঁধা দেওয়ার পেছনেও হয়ত যুক্তি থাকে (!), কিন্তু শাশুড়ীকে বাঁধা দেওয়ার ব্যাপারটি এক কথায় অকল্পনীয়। প্রথমত স্ত্রীর প্রতি স্বামীর অধিকার থাকলেও শাশুড়ীর প্রতি সেই অধিকার কোন মতেই স্বীকৃত নয়, তদুপরি আবার সামান্য একটি পান খাওয়ার জন্যে শাশুড়ীকে বাঁধা দেওয়া। কিন্তু ছড়ায় তাও সম্ভব।

শিশু বড়দের দেখে স্কুলে যেতে চাইলেও পরে স্কুল ব্যাপারটির সঙ্গে সম্যকভাবে পরিচিত হবার পর অধিকাংশ শিশুরই স্কুল সম্পর্কে একটা এলার্জি গড়ে উঠতে দেখা যায়। স্কুলের পরাধীনতায় শিশুর স্বাধীন চিত্ত হাঁফিয়ে ওঠে। তাই স্কুল বন্ধের সংবাদ স্বাভাবিক কারণেই শিশুর কাছে পরম বাঞ্ছিত এক ঘটনা। একটি ছড়ায় সেই বাঞ্ছিত ঘটনাটিকে কিভাবে ঘটান হয়েছে তার পরিচয় বিবৃত হয়েছে—

মাষ্টার মহাশয় নমস্কার
আপনি বড় পরিষ্কার।
গোলাপ ফুলের গন্ধ
হাইস্কুল বন্ধ।

স্কুল বন্ধ করতে গেলে মাষ্টার মশাইকে হাত করা চাই। তাই প্রথমেই তাঁকে খোশামোদ করার জন্যে 'বড় পরিষ্কার' বলে তাঁর মন রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। এবং শেষ পর্যন্ত মাষ্টারমশাইয়ের মন যে গলেছে তার প্রমাণও মিলেছে হাইস্কুল বন্ধ হওয়ার ঘটনায়। কেননা নিছক গোলাপ ফুলের গন্ধের সঙ্গে হাইস্কুল বন্ধের কোন কার্য-কারণ সম্পর্ক মেলে না। নতুবা

রোজই স্কুল বন্ধ রাখতে হয়। একটি নৃত্য সম্পর্কিত ছড়ায় এক জোলার সমগ্র পরিবারটির নৃত্যরত হওয়ার কথা বলা হয়েছে, যদিও নৃত্যরত হওয়ার কারণটি অকথিত রয়ে গেছে। অবশ্য বাস্তব জগতে যেমন সব কিছু কার্য-কারণ সূত্রে গ্রথিত, ছড়ার জগতে সেই সূত্র অনুসৃত হয় না। এখানে কারণ ব্যতিরেকেই কার্য হয়ে যায়—

জোলা নাচে জুলনী নাচে নাচে জোলার নাল,
সব চরকি উইঠ্যা বলে আমরা নাচব কাল।

জোলা এবং জুলনী কোন কারণে কিংবা অকারণে নৃত্যরত হতে পারে, সেজন্যে আমাদের চিন্তার কিছু থাকে না, কিন্তু তারপরই যখন বলা হয় সেই সঙ্গে জোলার নালটিও তাদের সঙ্গে নৃত্যরত, তখন সেই চিত্রটি কল্পনা করলে আর কি গাম্ভীর্য রক্ষা করা সম্ভব হয়? আবার এখানেই শেষ নয়, চরকি-গুলি দাঁড়িয়ে উঠে ঘোষণা করে তারা পরদিন নৃত্যানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবে, হয়ত বা আনন্দের রেশটা যাতে একদিনেই শেষ না হয়ে যায় সেই কারণে।

আর একটি মজার ছড়ার উল্লেখ করা গেল—

বুড়া আমায় মারিছে,
আঙ্গুল আমার ভাঙ্গিছে।
ভাঙ্গা আঙ্গুলে আমার আংটি পরাইছে॥
তোমরা হাস্য না গ বাপুরা,
বুড়া আমায় মারিছে।

বৃদ্ধ কর্তৃক বৃদ্ধার প্রহৃত হওয়ার ঘটনাটি নিঃসন্দেহে এক মর্মান্তিক ঘটনা। বিশেষত বৃদ্ধের প্রহারে বৃদ্ধার আঙ্গুল ভাঙ্গার ঘটনাটি। কিন্তু পরক্ষণেই যখন বলা হয় বৃদ্ধ অনুতপ্ত হয়ে বৃদ্ধার ভাঙ্গা আঙ্গুলে আংটি পরিয়ে দিয়ে তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছে, তখন এই ঘটনায় হাস্য সংবরণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। বুড়ী নিজেও এই হাস্যকর আচরণটি সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন, তাই তার বিনীত অনুরোধ ঘোষিত হয়েছে চতুর্থ চরণটিতে।

বুড়ী-বুড়োর আচরণ সম্বলিত আর একটি উপভোগ্য ছড়া—

শাকে ভাতে রান্ধে,
কলাগাছে টাঙ্গে।
কলা হইল বাড়ি,
বুড়ীর মাথাত ছাতি।
কলা হইল লাল,
বুড়ী ফুলায় গাল।
ছাতি নিল উড়াইয়া,
বুড়ী কান্দে দৌড়াইয়া।
কলা খায় বান্দরে,
বুড়ী মারে বুড়ারে।
ও বুড়ী কান্দ্য না,
বুড়ীরে আর মাইর না।
ঘরে আছে জামাই,
তারে দিয়া আনাই।
ঘরের পিছে হাইট্যা ধান,
কেচর কেচর কাট্যা আন।

আগের ছড়াটিতে যেমন বৃদ্ধ কর্তৃক বৃদ্ধার প্রহৃত হওয়ার ঘটনা স্থান পেয়েছে, এই ছড়াটিতে আবার দেখা যায় বৃদ্ধা কর্তৃক বৃদ্ধ প্রহৃত হয়েছে। আর এই প্রহৃত হওয়ায় কারণ হল বাঁদরের কলা খাওয়া। কিন্তু মজার ব্যাপার হ'ল বৃদ্ধা কর্তৃক বৃদ্ধ প্রহৃত হওয়ার পর বৃদ্ধা নিজেই ক্রন্দনরতা হয়েছে। পূর্বের ছড়াটিতে বৃদ্ধ মারধোর করে বৃদ্ধার আঙ্গুল ভেঙ্গে শেষে যেমন সেই ভাঙ্গা আঙ্গুলে আংটি পরিয়ে তার আচরণের প্রায়শ্চিত্ত করেছে, এখানে দেখি বৃদ্ধা চোখের জলের মধ্য দিয়ে তার অনুশোচনা প্রকাশ করেছে। এ পর্যন্তও না হয় মানা গেল, কিন্তু অস্বাভাবিকতা অপেক্ষা করে আছে এর পরেই যখন বৃদ্ধাকে আর না মারার জন্যে অনুরোধ উচ্চারিত হয়েছে। অথচ প্রহারকারিণী নিজে কখন যে প্রহৃত হল তার উল্লেখ অনুপস্থিত অর্থাৎ ছড়ায় যে মারে, সেই কাঁদে, আবার তাকেই শেষে সান্ত্বনা

দিতে হয় আর প্রহার করা হবে না বলে।

বিবাহের দিনে বরই হ'ল প্রধান আকর্ষণীয় পুরুষ। বরের সাজ-সজ্জার আকর্ষণও নেহাৎ কম নয়। তাই কথায় বলে 'বরের সাজ'। কিন্তু একটি ছড়ায় বরের সাজের যে বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে, তেমনটি কোন কালে কোন বরের পক্ষে সাজা অসম্ভব। ছড়ার বর কিন্তু এই অদ্বিতীয় সাজে সজ্জিত হয়েছে অনায়াসেই—

আশালতা পালংপাতা
আজকে আশার বিয়ে,
হাওড়া থেকে বর এসেছে
গামলা মাথায় দিয়ে।

এর পর বরের রূপ বর্ণিত হয়েছে যে ভাবে, তাও এককথায় অননুকরণীয় বলা চলে—

বর দেখনা, বর দেখনা
রান্নি শালের ঝুল
কন্যা দেখনা, কন্যা দেখনা
কনক চাঁপার ফুল।

বর কুৎসিত দর্শন বলে না হয় তাকে দেখতে নিষেধ করা হয়েছে, কিন্তু কনক চাঁপার মতন দেখতে যে কনেকে, তাকেও দেখতে যে কেন নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে, তার কোন যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা মেলে না। অবশ্য মেলে না বলেই এটি ছড়া হয়েছে, মিললে আর তা ছড়া থাকত না।

এইভাবে বাংলা লোক-সাহিত্য হাস্যরসের অফুরন্ত খনি বিশেষে পরিণত হয়ে আছে। প্রয়োজন হ'ল উপযুক্ত রসিক ব্যক্তির, যিনি এই খনি থেকে সংগ্রহ করে আনবেন মূল্যবান মণি-মাণিক্যগুলি নিজের এবং অপরের আস্বাদনের জন্যে।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে লোক-বিশ্বাস ও লোক-সংস্কার

সাহিত্য সমসাময়িক কালের নির্ভরযোগ্য নিদর্শন, কারণ যথার্থ সাহিত্য কখনই সমসাময়িক কালের সমাজ তথা জীবনকে অস্বীকার করতে পারে না। তাই বিশেষ একটি যুগের বা কালের পরিচয় পেতে সেই যুগের বা কালের সাহিত্য এক গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে থাকে। আমাদের প্রাচীন ও মধ্যযুগের লিখিত সাহিত্য মূলতঃ ধর্মকেন্দ্রিক। তাই এই সময়-কার সাহিত্যে আমরা তেমন করে তৎকালীন সমাজ এবং জীবনের চিত্রণ আশা করতে পারি না। তবু এরই মধ্যে প্রাচীন ও মধ্যযুগের কবিরা তাঁদের রচিত কাব্যে যে সমাজ সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন তা বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা প্রাচীন এবং মধ্যযুগের বাংলা কাব্যসাহিত্য অবলম্বনে সে সময়ে প্রচলিত লোক-বিশ্বাস এবং লোক-সংস্কারের কিছু পরিচয় গ্রহণ করব। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, কোন সমাজই লোক-বিশ্বাস এবং লোক-সংস্কার থেকে মুক্ত নয়। বরং যে সময়ের সাহিত্য অবলম্বনে আমরা লোক-বিশ্বাস এবং লোক-সংস্কারের পরিচয় গ্রহণ করব, সে সময়ে এসবের আধিপত্য ছিল এখনকার তুলনায় অনেক বেশি। লোক-বিশ্বাস ও লোক-সংস্কার যেহেতু সমাজের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, সেইহেতু এগুলির প্রকাশের মধ্য দিয়ে কবিরা প্রকারান্তরে সমাজ সচেতনতারই পরিচয় দিয়েছেন বলে স্বীকার করে নেওয়া যেতে পারে।

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন হল চর্যাপদ॥ কিন্তু চর্যাপদে প্রবাদের উল্লেখ লক্ষ্য করা গেলেও কোন লোক-বিশ্বাস অথবা লোক-সংস্কারের উল্লেখ সেখানে অনুপস্থিত। সেদিক দিয়ে বিচার করলে বড়ু চণ্ডীদাস রচিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যটিতেই প্রথম বিশ্বাস এবং সংস্কার উল্লিখিত হয়েছে।

'দানখণ্ডে' রাধা বলেছেন :

কালিনী মাত্র মোর নাম থুইল রাধা।
হাঁছি জিঠী কেহ্নো তাত না দিল বিরোধা॥

[পৃঃ ৩৮; ৫ম সংস্করণ, সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ]

—এখানে রাধা বলেছেন যে কালিনী মা যখন তাঁর নাম রাধা রেখেছেন, তখন কোন বাধা পড়েনি, কারণ তখন কেউ হাঁচেওনি অথবা টিকটিকিও ডাকেনি। এর থেকেই বোঝা যায় হাঁচি, টিকটিকি সংক্রান্ত সংস্কারটি কত দীর্ঘদিন ধরেই আমাদের সমাজে প্রচলিত। 'দান খণ্ডে'র অন্যত্র হাঁচি-টিকটিকির কথা উল্লিখিত হয়েছে—

কমণ আসুভক্ষণে বাঢ়ায়িঁ লো পা।
হাঁছী জিঠী তাত কেহ্নো নাহিঁ দিল বাধা॥

[পৃঃ ৪০, ৫ম সংস্করণ; সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ]

প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী ভাদ্র শুক্লা চতুর্থীর চাঁদ দেখলে, পূর্ণ কলসীতে হাত ঢোকালে এবং মাটির ওপর জলের আঁক কাটলে মিথ্যা কলঙ্ক রটে। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে'ও এই বিশ্বাসগুলি উল্লিখিত হয়েছে—

হরিতালী চন্দ্র দেখিলোঁ ভাদ্রমাসে।
হাথ ভরিলোঁ কিবা পুরিল কলসে॥
ভূমিত আখর কিবা লিখিলোঁ জলে।
মিছা দোষে বন্ধন আহ্মার তার ফলে॥ ১॥

[বাণখণ্ড; পৃঃ ১১২; ৫ম সংস্করণ; সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ]

হাতী, ঘোড়া বা সাপের মাথায় খঞ্জন দেখলে দ্রষ্টার শ্রীবৃদ্ধি হয় বলে বিশ্বাস। কিন্তু কৃষ্ণ বলছেন তাঁর ক্ষেত্রে শ্রীবৃদ্ধিলাভ দূরে থাকুক, জীবন সংশয় উপস্থিত—

মুখ কমলে আতি শোভা করে
খঞ্জন নয়ন দুঈ।
ভ্রূহি কালশাপ যুগল তাহাত
শোভএ নিচল হোই ॥
আন যদি দেখে রাজপদ পাএ
নানা উপভোগে লহে।
আছু রাজপদ দূর বড়ায়ি
জীবন মোর সন্দেহে ॥ ১ ॥

[দানখণ্ড ; পৃঃ ২৯ ; ঐ]

কোন কথা তিনবার করে বললে বা তিনসত্যি করলে তা যেমন সত্য বলে বিশ্বাস করা হয়, তেমনি ভূমি এবং কান স্পর্শ করে কেউ কোন শপথ করলে তাও সত্য বলে বিশ্বাস করার সংস্কার প্রচলিত। এই সংস্কারটিরও উল্লেখ দেখা যায় 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'—

ভূমি ছুই আঁ হাথ পরসওঁ দুঈ কানে।
এভোঁহো কাহ্নাঞিঁ তোত না ভৈল গে আনে ॥

[দানখণ্ড ; পৃঃ ৪১ ; ঐ]

দাঁতে তৃণ ধরে কোন কিছু শপথ করলে তা নিশ্চিত রক্ষিত হবে বলে ধরে নেওয়া হয়। এই লোক-সংস্কারটি শ্রীরাধিকার মাধ্যমে উপস্থাপিত হতে দেখা গেছে। শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীরাধা বলেছেন :

দশনেত তৃণ করি বোলোঁ মো তোহ্মারে।
যেই চাহ সেহি দিবোঁ কর মোরে পারে ॥১৬॥

[নৌকাখণ্ড ; পৃঃ ৬২ , ঐ]

যাত্রাকালে কতকগুলি লক্ষণ দেখে স্থির করা হয় যাত্রা শুভ হবে না অশুভ হবে। বিশ্বাস, অশুভ লক্ষণ দেখে যাত্রা করলে যাত্রা ব্যর্থ হয়। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' এই সম্পর্কিত লোক-বিশ্বাসের পরিচয় বিধৃত হয়েছে এইভাবে—

ঘরের বাহির হৈতেঁ তেলিনি তেল বিচিতেঁ
কাল কাক রএ সুখান গাছের ডালে।

আগেঁ সুনা ঘটে নারী হাঁছী জিঠিহো না বারী
চলিলোঁ তাহার উচিত পাওঁ ফলে ॥১॥

[দান খণ্ড ; পৃঃ ৪৬ ; ঐ]

অর্থাৎ যাত্রাকালে যদি তেলেনীকে তেল বিক্রয় করতে দেখা যায়, কিংবা শুষ্ক বৃক্ষ ডালে কাককে উপবিষ্ট দেখা যায়, অথবা শূন্য কলসীসহ কোন রমণীকে আগে আগে গমনরতা দেখা যায়, তাছাড়া হাঁচির শব্দ, টিকটিকি ইত্যাদির ডাক যদি শোনা যায়, তাহলে বুঝতে হবে যাত্রায় বাধা পড়েছে। এইসব বাধা না মানলে যাত্রা ব্যর্থ হবার সম্ভাবনা সমধিক।

যাত্রার সময় যদি কেউ পেছন থেকে ডাকে, তাহলেও যাত্রায় বাধা পড়ে, এই বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটেছে চন্দ্রাবলীর একটি উক্তিতে—

আজি জখনে মোঁ বাঢ়ায়িলোঁ পাএ।
পাছেঁ ডাক দিল কালিনী মাএ॥
তার ফলেঁ মোর পরাণ-পতী।
মোক ছাড়ী কাহ্নাঞিঁ গেলা কতী ॥১॥

[কালিয়াদমন খণ্ড ; পৃঃ ৯১ ; ঐ]

যাত্রাকালে চন্দ্রাবলীকে কালিনী পেছন থেকে ডাকার ফলেই আর তার পক্ষে প্রাণপতি কৃষ্ণকে লাভ করা সম্ভব হল না বলে চন্দ্রাবলী দুঃখ করেছে। যাত্রা কি কি কারণে অযাত্রায় পরিণত হয়, তার বিস্তারিত বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে 'বংশী খণ্ডে'—

কোন আসুভ খনে পাএ বাঢ়ায়িলোঁ।
হাঁছী জিঠী আয়র উঝঁট না মানিলোঁ॥
শুন কলসী লই সখী আগে জাএ।
বাঞ্চর শিআল মোর ডাহিনেঁ জাএ ॥১॥

* * *

কথো দূর পথে মোঁ দেখিলোঁ সগুণী।
হাথে থাপর ভিখ মাঙ্গএ যোগিনী॥
কান্ধে কুরুআ লআঁ তেলী আগে জাএ।

সুখান ডালত বসি কাক কাঢ়ে রাএ ॥২॥ [পৃঃ ১২৫ ; ঐ]

কি কি কারণে বদনাম হয় তার উল্লেখ আমরা ইতিপূর্বেই দেখেছি, কাব্যের অন্যত্রও এই প্রসঙ্গে সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে—

ভাদরমাসের তিথি চতুর্থীর রাতী।
জল মাঝেঁ দেখিলোঁ মো কি নিশাপতী ॥
পূন্ন কলসে কিবা ভরিলোঁ হাথে।
তেকারণে বাঁশী চুরী দোষসি জগন্নাথে ॥১॥

*   *   *

গুরুর আসনে কিবা চাপিআঁ বসিলোঁ।
জলের আখর কিবা ভূমিত লেখিলোঁ ॥
খণ্ড বিচনীর কিবা বাএ তূলী লৈলোঁ গাএ।
তেকারণে কাহ্নাঞিঁ বাঁশী চুরী দোষাএ ॥২॥

[বংশীখণ্ড ; পৃঃ ১২৬ ; ঐ]

অর্থাৎ ভাদ্র শুক্লা চতুর্থীর চাঁদ দর্শনে কিংবা পূর্ণ কলসীতে হাত ঢোকালে অথবা মাটির ওপর জলের আঁক কাটা ছাড়াও যদি কেউ জলের মধ্যে চাঁদকে দেখে অথবা গুরুর আসনে উপবেশন করে তাহলেও বদনামের ভাগী হতে হয় বলে বিশ্বাস প্রকাশিত হয়েছে।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ পাদে রচিত কৃত্তিবাসী রামায়ণেও আমরা বেশ কিছু লোক-বিশ্বাস এবং লোক-সংস্কারের উল্লেখ লক্ষ্য করতে পারি।

মহর্ষি ভগীরথ তপস্যার উদ্দেশ্যে গমনকালে তাঁর দক্ষিণ নয়ন স্পন্দিত হয়েছিল, যা নাকি শুভযাত্রার লক্ষণ বলে বিবেচিত হয়ে থাকে—

যাত্রাকালে করে রাজা মায়ের স্মরণ।
দক্ষিণ নয়ন তার করিছে স্পন্দন ॥

[আদিকাণ্ড ; পৃঃ ১৬ ; পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি সংস্করণ]

রাত্রে দই-ভাত খাওয়া অবিধেয়। অন্ধক মুনি পুত্রশোকে বিলাপ করতে গিয়ে বলেছেন :

দধির সংযোগে রাত্রে নাহি খাই ভাত ॥ [আদিকাণ্ড ; পৃঃ ৩৭ ; ঐ]

জাতকের জন্মের ছয়দিনের দিন বিনিদ্র রজনী যাপন করতে হয় জাতকের জননীকে। এই সংস্কারটির উল্লেখে বলা হয়েছে ঃ

ছয়দিনে ষষ্ঠীপূজা নিশি জাগরণে। [আদিকাণ্ড ; পৃঃ ৫৩ , ঐ]

যাত্রাকালে নারীর স্পর্শলাভ অবিধেয়, কারণ তাতে যাত্রা ব্যর্থ হয়ে যায় বলে বিশ্বাস। মন্দোদরী ইন্দ্রজিৎকে তার নয় হাজার পরমা সুন্দরী নারীর সেবা গ্রহণের জন্য আহ্বান জানালে ইন্দ্রজিৎ বলেছে ঃ

যাত্রাকালে ছুঁলে নারী পড়িবে প্রমাদ।
এত বলি বিদায় হইল মেঘনাদ ॥

[লঙ্কাকাণ্ড , পৃঃ ২৭৪ , ঐ]

লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে যাত্রাকালে সীতা নানা অশুভ লক্ষণ দেখে আতঙ্কিত হয়েছেন এবং তাঁর মনে সংশয় উপস্থিত হয়েছে যে তাঁর পক্ষে আর হয়ত অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করা সম্ভব হবে না।

বামেতে দেখেন সর্প শৃগাল দক্ষিণে।
অমঙ্গল দেখি সীতা কহেন লক্ষ্মণে ॥
লক্ষ্মণ, অশুভ নানা কেন দেখি পথে।
না যাব অযোধ্যা ফিরে হেন লয় চিতে ॥

[উত্তরাকাণ্ড ; পৃঃ ৪৩৯ ; ঐ]

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী রচিত 'অভয়ামঙ্গল' কাব্যটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। কবি যদিও চণ্ডীমঙ্গলের প্রচলিত কাহিনীর কাঠামো অবলম্বনে তাঁর কাব্যটি রচনা করেছিলেন, তবু কাব্যটির নানাস্থলেই ষোড়শ শতাব্দীর শেষ পাদের বাংলা দেশে প্রচলিত বহু বিশ্বাস এবং সংস্কার উল্লিখিত হয়েছে লক্ষিত হয়। যেমন অশুভ লক্ষণের বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি উল্লেখ করেছেন—

পান লৈতে নীলাম্বর কৈল জোড় কর।
ডাকিল শকুনি তার মাথার উপর ॥
জ্যেঠীডাক নীলাম্বর করিল শ্রবণ।
দৈবযোগে তাহা নাহি শুনে অন্যজন ॥

বুকে হাত দিয়া নিবেদয়ে নীলাম্বর।
পড়িল গোঁসাই বাধা মস্তক উপর॥

[ইন্দ্রের শিবপূজার আয়োজন ; পৃঃ ৩০ ; বসুমতী সংস্করণ]

মাথার ওপর শকুনির ডাক, টিকটিকির ডাক ইত্যাদি যে অশুভ, এখানে তারই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। কাব্যের অন্যত্রও শুভ-অশুভ লক্ষণের বিস্তারিত উল্লেখ লক্ষণীয়—

দক্ষিণে গো মৃগ দ্বিজ বিকশিত সরসিজ
বামে শিবা ঘটে পূর্ণ জল॥
চৌদিকে মঙ্গলধ্বনি দক্ষিণে আশুশুক্ষণি
দধি দধি ডাকে গোয়ালিনী।
দেখিল রুচির তনু বৎসের সহিত ধেনু
পুরাঙ্গনা দেয় জয়ধ্বনি॥

* * *

গোধিকা যাত্রিক নয় সকল শাস্ত্রেতে কয়
কূর্ম্ম গণ্ডা শশক শল্লক।

[কালকেতুর বনযাত্রা ; পৃঃ ৪৫ ; ঐ]

পুরুষের ক্ষেত্রে দক্ষিণ আঁখি অথবা দেহের দক্ষিণ ভাগ যদি স্পন্দিত হয়, তবে তা শুভ লক্ষণ বলে বিবেচিত হয়, কিন্তু মহিলাদের ক্ষেত্রে বাম অঙ্গ অথবা বাম আঁখির স্পন্দনকে শুভ লক্ষণ বলে মনে করা হয়। চণ্ডীর সঙ্গে ফুল্লরার সাক্ষাৎকারের বিবরণ দিতে গিয়ে তাই কবি বর্ণনা করেছেন—

বাম বাহু স্পন্দে তার স্পন্দে বাম আঁখি।
কুঁড়ের দুয়ারে দেখে রামা চন্দ্রমুখী॥ [পৃঃ ৫১ ; ঐ]

ধনপতি সদাগরের উপাখ্যানে রত্নমালা বিলাপকালে বলেছে যে পূর্ব্ব থেকে সে কোন বাধার লক্ষণ লক্ষ্য করেনি, না শুনেছে হাঁচির শব্দ, না শুনেছে টিকটিকির ডাক, তবু শেষপর্যন্ত অজ্ঞাত কারণে তাকে শাস্তিভোগ করতে হ'ল, গৃহে প্রত্যাবর্তন করা আর তার হয়ে উঠল না—

কেমন দারুণ বেলা আইনু তাণ্ডব-শালা

হাঁচি জেঠী না পড়িল বাধ।

বিধাতা দণ্ডিল মোরে ফিরে না গেলাম ঘরে

মনে বড় রহিল বিষাদ॥ [পৃঃ ৯২ ; ঐ]

আগেই উল্লিখিত হয়েছে যে মহিলাদের ক্ষেত্রে বাম অঙ্গ বা আঁখি স্পন্দিত হওয়াকে শুভ ইঙ্গিত বলে গণ্য করা হয়, কিন্তু তৎপরিবর্তে যদি দক্ষিণ অঙ্গ বা আঁখি স্পন্দিত হয়, তবে তা অশুভ ইঙ্গিত হয়ে দাঁড়ায়। দুর্ব্বলার কাছে লহনা খেদ করে বলেছে—

দেখিয়ে কুস্বপ্ন বহু স্পন্দে ডানি আঁখি বাহু

লহনা কহেন মন-কথা।

শুনিয়া লোকের মুখে শেল যেন বাজে বুকে

প্রভু দিবে নিদারুণ সতা॥

[দুর্ব্বলার নিকটে লহনার খেদ ; পৃঃ ৯৬ ; ঐ]

আজকের সমাজে বহুবিবাহপ্রথা নিষিদ্ধ হলেও, আগেকার দিনে এই প্রথা ছিল বহুল প্রচলিত। তাই স্বভাবতঃই স্বামীকে নিজের বশীভূত করতে স্ত্রীরা সচেষ্ট হ'ত। এমনকি এ ব্যাপারে বশীকরণেরও সহায়তা নেওয়া হ'ত। রম্ভাবতীর বশীকরণ-ঔষধ সংগ্রহের বিস্তৃত বিবরণে বলা হয়েছে—

কাটা মহিষের আনে নাসিকার দড়ি।

দুর্গার প্রদীপ পুঁতে রেখেছিল চেড়ী॥

সাধুর কপালে যবে দিব পুনর্ব্বসু।

খুল্লনার হবে সাধু নাকবিন্ধা পশু॥

আনিল পাকড়ি ডাল হাঁই আমলাপাতি।

আকুল কুন্তল করি আনে মধ্য রাতি॥

সাপের আঁটুলি আনে খুঁজে বেদের ঘরে।

কই মৎস্য—পিত্ত আনে মঙ্গল বাসরে॥

কাপাসের ক্ষেত হৈতে আনিল গোমুণ্ড।

দাণ্ডাইয়া রবে সাধু তার দুই দণ্ড॥ [পৃঃ ৯৯ ; ঐ]

সাধু যাতে খুল্লনার প্রতি আসক্ত থাকে, সে জন্যে রম্ভাবতী আরও যে

সব স্ত্রী আচারের অনুষ্ঠান করল, তা হল—

সূত্র দিয়া মাপে রম্ভা বরের অধর।
সেইরূপে মাপে আর দুইখানি কর॥
সেই সুতা দিয়া বান্ধে খুল্লনার সনে।
সাধু রহিলেন যেন নিগড় বন্ধনে॥
আনিল এয়োর সুতা নাটাই সহিত।
সাত ফের ফিরাইয়া করিয়া বেষ্টিত॥
সেই সুতা বান্ধি রাখে খুল্লনা অঞ্চলে।
গালি দিলে সাধু যেন মুখ নাহি তোলে॥

[স্ত্রী আচার ; পৃঃ ১০০ ; ঐ]

এ পর্যন্ত গেল স্বামীকে বিশেষ এক স্ত্রীর প্রতি আসক্ত করে তোলার বিবরণ, এইবার বিশেষ এক স্ত্রীর প্রতি স্বামীকে বিরূপ করে তোলার ব্যাপারে যে সব আচার অনুসৃত হ'ত, তার কিছু পরিচয় গ্রহণ করা যেতে পারে। খুল্লনা যাতে সাধুর বিষনজরে পড়ে, সেজন্যে লীলাবতী লহনাকে পরামর্শ দিয়েছে এইভাবে—

পত্রিকার কলাগাছ রোপিয়া অঙ্গনে।
ঘৃতের প্রদীপ তাহে দিবে রাত্রি দিনে॥
নিরামিষ অন্ন খাবে তার পত্র পাড়ি।
সাধু হবে কিঙ্কর খুল্লনা হবে চেড়ী॥
শ্মশানের ক্ষীরা আর কবর বিছাতি।
বসন ত্যজিয়া তাহা আন শেষ রাতি॥
ইহাই বাঁটিয়া দেহ খুল্লনা-বসনে।
খুল্লনা পড়িবে তার বিষের নয়নে॥
চূণে পানে খয়েরে করিয়া তার ক্ষার
কালো গরুর গাঁজা আন ঔষধের সার॥
দুর্গার মুখের আর আন হরিতাল।
উপরাগ সময়ে আনহ বেড়াজাল॥

ছুই বস্তু কপালে রাখিবে সাবধানে।
সোহাগ বাড়িবে তব দুর্গার সমানে॥
আনিবে আধুলি কীট ফণিফণা হৈতে।
তাবিজ গড়াইয়া রাখিবে বাম হাতে॥

* * *

যতনে আনিবে জোড়া অশ্বত্থের দল।
দুর্গার প্রদীপ তৈলে পরিবা কাজল॥
লোচনে কাজল দিয়া চাহ একবার।
সাধুকে করিয়া দিব যেন কণ্ঠহার॥

[লহনার প্রতি লীলাবতীর ঔষধ ব্যবস্থা ; পৃঃ ১০৮-১০৯, ঐ]

স্পষ্টতঃই শেষাংশে সাধুকে কি ভাবে বশীভূত করা যাবে, তার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। মোটের ওপর স্বামীকে কোন একজনের প্রতি বিরূপ অথবা আসক্ত করার ব্যাপারে বিশেষ কতকগুলো আচার এবং উপকরণ যে ক্রিয়াশীল, এখানে সেই বিশ্বাসই বিশেষভাবে পরিস্ফুট!

১৬১০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে রচিত কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত 'চৈতন্য চরিতামৃতে'ও বিশ্বাস এবং সংস্কার বিধৃত হয়েছে লক্ষ্য করা যায়। অদ্বৈত আচার্যের পত্নী সীতাঠাকুরানী সদ্যোজাত গৌরাঙ্গকে দেখতে যাবার সময় সঙ্গে নানাবিধ উপহার সামগ্রী নিয়েছিলেন। এ সবের মধ্যে ছিল—

ব্যাঘ্রনখ হেমজড়ি কটি পট্টসূত্র ডোরী
হস্তপদের যত আভরণ।

[আদিলীলা ; পৃঃ ৭১ ; বসুমতী সংস্করণ]

ব্যাঘ্রনখ শিশুকে পরালে শিশু উত্তম স্বাস্থ্যের অধিকারী হয় বলে বিশ্বাস। তাই অনেকেই শিশুকে সংস্কারবশতঃ ব্যাঘ্রনখ ধারণ করান। সীতা ঠাকুরাণী গৌরাঙ্গের জন্যে যে অন্যান্য আভরণের সঙ্গে ব্যাঘ্রনখও নিয়ে গিয়েছিলেন, এখানে তার উল্লেখ লক্ষণীয়।

অশুভ শক্তির প্রভাব থেকে মুক্ত করার জন্যে শিশুর বিশেষ কয়েকটি নামকরণ করা হয়ে থাকে। প্রচলিত বিশ্বাস, এর ফলে অশুভ শক্তির দৃষ্টি

থেকে শিশু মুক্ত থাকে। শ্রীগৌরাঙ্গের নামকরণ করা হয়েছিল নিমাই, কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে চরিতামৃতকার বলেছেন ঃ

ডাকিনী শাকিনী হৈতে শঙ্কা উপজিল চিতে

ডরে নাম থুইল নিমাই॥ [আদিলীলা ; পৃঃ ৭২ ; ঐ]

সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত 'গোপীচন্দ্রের গানে'ও আমরা বেশ কিছু বিশ্বাস এবং সংস্কারের সন্ধান পাই। যেমন,

লাংটি চিপি শাপ দেন রাজাক মঙ্গলবার দিনা ॥৭৫

[গোপীচন্দ্রের গান ; জন্ম ; পৃঃ ৫]

বাংলার লোক-বিশ্বাসে মঙ্গলবার এবং শনিবার black magic বা কৃষ্ণ ইন্দ্রজাল প্রয়োগের প্রশস্ত দিন। মঙ্গল পাপগ্রহ এবং এই গ্রহের নামাঙ্কিত বারটিকেও পাপাশ্রিত বলে মনে করা হয়। তাই মঙ্গলবার কোন শুভকাজ করা হয় না। তাছাড়া এইদিন কাউকে অভিশাপ দিলে তা ব্যর্থ হয় না বলে বিশ্বাস। এই জন্যেই মহাদেব মাণিকচন্দ্রকে মঙ্গলবারে অভিশাপ দিয়েছিলেন লক্ষ্য করা যায়।

হরিবোল বলিয়া ছিনান করিয়া।

কালো ধবল পাঠা দেও বলিছেদ করিয়া॥

[গোপীচন্দ্রের গান ; জন্ম ; পৃঃ ৫]

দেবতার কল্পিত রঙের সঙ্গে সাদৃশ্য রেখে সেই রঙের পশু দেবতার উদ্দেশে বলি দেবার সঙ্কল্প করলে দেবতা অধিকতর সন্তুষ্ট হন এবং ভক্তের মনোবাসনা পূর্ণ করেন বলে সংস্কার প্রচলিত। সেই হিসাবে কালো ধবল পাঁঠা বলি দেবার বিষয়টি এখানে উল্লিখিত হতে দেখা গেছে। সাধারণতঃ মিত্র দেবতার কাছে সাদা রঙের বলি এবং কালী বা বরুণ দেবতার উদ্দেশে কালো প্রাণী বলি দেওয়া হয়ে থাকে।

কালা-ধলা পাঁঠা মানত করার কথা 'মৈমনসিংহ গীতিকা'তেও বর্ণিত হয়েছে—

নত্থার ঠাকুর খাইতে বইছে গলাত লাগ্‌ছে কাঁটা।

বাত্থার ছেড়ী মান্যা থুইছে কালা ধলা পাঁঠা॥

অবশ্য গ্রীয়ারসন সংগৃহীত পাঠে কাল পাঁঠার কথার উল্লিখিত হয়নি,

উল্লিখিত হয়েছে কেবল ধলা পাঁঠার কথা।

লোক-বিশ্বাসে 'জীউ' বা আত্মা হল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু। প্রাণীর মৃত্যুর পর তার আত্মা দেহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যায়। এই বিশ্বাস পৃথিবীর নানা অঞ্চলে বিশেষত আদিজাতির সমাজে প্রচলিত। আরও ধারণা হল যে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য 'জীউ' কে ইচ্ছা করলে পাত্রমধ্যে আবদ্ধ করে রাখা যায়। এই বিশ্বাস থেকেই গোদা যম কর্তৃক সদ্যোমৃত মাণিকচন্দ্রের জীউকে লেংটিতে বেঁধে নেওয়ার কথা বলা হয়েছে—

মরণনুড়ি দিয়া রাজাক হুই ডাঙ্গ দিল।
রাজার জীউ গোদা যম লাংটিতে বান্ধি নিল॥

[গোপীচন্দ্রের গান ; জন্ম ; পৃঃ ১৮]

মনসামঙ্গলেও অনুরূপ বর্ণনা লক্ষ্য করা যায়—

সোনা রূপার কৌটাতে অনি-উষাকে ভরিয়া।
চম্পা নগরে যান জিতেন্দ্রিয় হঞা।

—বিষ্ণু পাল।

কোন দুর্ঘটনা বা অশুভ কিছু ঘটার আগে তার আভাস পাওয়া যায় বলে লোক-বিশ্বাস প্রচলিত। 'গোপীচন্দ্রের গানে'ও তার পরিচয় রয়েছে। ময়না তার সিঁথের সিঁদুর এবং হাতের শাঁখা যা নাকি এয়োতির চিহ্ন, তা মলিন দেখে কাঁদতে শুরু করে দিয়েছে ভাবী বিপদের আশঙ্কায় :

শীষের সিন্দুর হাতের শঙ্খা মৈলান দেখিল।
কপালত চড়িয়া ময়না কান্দন জুড়িল॥ [জন্ম ; পৃঃ ১৮]

একই কথা তিনবার উচ্চারণ করে যে শপথ করা হয় তাকে বলা হয় তিনসত্যি করা। লোক-বিশ্বাস তিনসত্যি করার পর কারো পক্ষে তা আর রক্ষা না করে উপায় থাকেনা। কারণ তিনসত্যি করার পরও যদি তা রক্ষিত না হয়, তাহলে শপথ ভঙ্গকারীর মহা অকল্যাণ হবার সম্ভাবনা। 'গোপীচন্দ্রের গানে'ও এই বিশ্বাসের প্রমাণ রয়েছে। গোপীচন্দ্র তার মা ময়নামতীকে দিয়ে তিন সত্যি করিয়ে নিয়েছে—

এক সত্য দুই সত্য তিন সত্য করি।

যদি তোমাক ছাড়িয়া পালাই প্রাণ ফাইটা মরি ॥ ৫৮০

[বুরান ; পৃঃ ৭৪]

এইবার সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের 'মনসামঙ্গল' থেকে কিছু উদাহরণ উদ্ধার করা গেল। সন্তান জন্মগ্রহণের পর ছ' দিনের দিন নবজাতকের মাথার কাছে দোয়াত, কলম, মিষ্টি ইত্যাদি রেখে দিতে হয়। বিশ্বাস হল ঐদিন বিধাতাপুরুষ স্বয়ং এসে জাতকের ভাগ্যলিপি রচনা করে যান। লখিন্দরের জন্মের ছয় দিনের দিন সনকা এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে নির্দিষ্ট আচার পালন করেছিলেন বলে মনসামঙ্গলে বর্ণিত হয়েছে :

সনকা সুন্দরী ষষ্ঠীপূজা করি
যাহার যে রীতি আছে।
হাতে অস্ত্র লৈয়া রহিল বসিয়া
মসিপত্র লৈয়া কাছে ॥
অর্ধরাত্রি গেলে বিধি হেনকালে
লিখিতে আইল ভালে। [লখিন্দরের জন্ম ; পৃঃ ১৫]

চিরুনদাঁতী রমণী অত্যন্ত অলুক্ষণে বলে লোক-বিশ্বাস প্রচলিত। এইরকম রমণীর স্বামী অকালমৃত্যু বরণ করে বলে বিশ্বাস। লখিন্দরের মৃত্যুতে শোক বিহ্বলা সনকা বেহুলাকে এই বলে গালাগাল দিয়েছেন—

খণ্ড-কপালিনী তুই বেহুলা চিরুনদাঁতী।
বিভা-দিনে খাইলি পতি না পোহাতে রাতি ॥ ২০ ॥

[সনকার ক্রন্দন ; পৃঃ ৪৫]

নগরের কুলকামিনীরাও বেহুলাকে একই ভাবে ভর্ৎসনা করে বলেছে—

তুই উচ্চ কপালিনী হও চিরুনদাঁতিনী
বাসরে খাইলে প্রাণনাথ ॥ ৩৬ ॥

[বেহুলার কলার মান্দাসে ভাসিবার প্রস্তাব ; পৃঃ ৪৮]

কেতকাদাসের কাব্যেও মনসা কর্তৃক তিনসত্য করার কথা বর্ণিত হয়েছে—

সত্য সত্য তিনবার বলেন বিশ্বমাতা।

শুনহ দেবতাগণ বেহুলার কথা ॥

[সদাগরের ডিঙ্গা উদ্ধার ও বেহুলার দেশে গমন ; পৃঃ ৮০]

পরিশেষে অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের কাব্য থেকে কয়েকটি বিশ্বাস ও সংস্কারের উল্লেখ করা হল। কেউ হাঁচলে তৎক্ষণাৎ 'জীব' বলতে হয়। এইকারণে সুন্দরের আচরণে খুব্ধ রাজকুমারী বিদ্যার মান ভাঙ্গানোর জন্যে কুমার সুন্দর ইচ্ছাপূর্ব্বক নাকে কাঠি দিয়ে হেঁচেছে, যাতে বিদ্যাকে 'জীব' বলতে হয়—

চতুর কুমার ভাবে জীব বাক্যে মান যাবে
হাঁচিলেন নাকে কাঠি দিয়া।
চতুর কুমারী ভাবে জীব কৈলে মান যাবে
জীব কব কথা না কহিয়া ॥

[ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী ; বিদ্যাসুন্দর ; পৃঃ ৪০, বসুমতী সংস্করণ]

বিবাহিতা রমণীর হাতে আর কিছু না থাক অন্ততঃ পক্ষে একখানি লোহার নোয়া রাখতেই হয়, এটি হ'ল সধবা রমণীর চিহ্ন। লোহা ধারণ করলে স্বামীর কল্যাণ হয় বলে সংস্কার। পদ্মিনী বলে এক দুঃস্থা রমণী সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে—

আয়তের চিহ্ন হাতে লোহা একগাছি।
পান বিনা পদ্মিনীর মুখে উড়ে মাছি ॥ [অন্নদামঙ্গল, পৃঃ ১২৬]

ভবানন্দ মজুমদারের দিল্লী-যাত্রা বর্ণনা প্রসঙ্গে যাত্রাকালীন নানা মাঙ্গলিক বস্তু ও দৃশ্যের বর্ণনা দান করেছেন কবি। যেমন—

ধেনুবৎস এক স্থানে বৃষ খুরে ক্ষিতিটানে
দক্ষিণেতে ব্রাহ্মণ অনল। [মানসিংহ, পৃঃ ১৩৮]

এইভাবে আমরা প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য থেকে তৎকালীন সমাজে প্রচলিত নানা ধরণের বিশ্বাস এবং সংস্কারের সন্ধান পেতে পারি, নৃতত্ত্ব ও সমাজতাত্ত্বিক আলোচনায় যেগুলি মূল্যবান উপাদান হিসাবে স্বীকৃত হবার দাবী রাখে।